মনঃসমীক্ষণ

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—কার্তিক ১৩৪৮
পুনর্মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৫২
মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—১০, ৮, ৪৫

মুখবন্ধ

মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে অনেকেরই যে বিশেষ কৌতূহল আছে এবং সঠিক জ্ঞানলাভের বাসনা আছে,' বহুদিন পূর্বেই তাহা লক্ষ্য করি। 'শনিবারের চিঠি'র শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-পুস্তকাদি যাহাতে রচিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের যত্নবান হওয়া উচিত। সুবলবাবু যেন আমার এই কথাটির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পত্রিকার তরফ হইতে তিনি আমাকেই লেখার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়া গেলেন। কতকটা অনন্যোপায় হইয়া আমাকে রাজি হইতেই হইল। ইহাই হইল এই পুস্তক প্রণয়নের ইতিহাস। পুস্তকে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সজনীবাবুর সৌজন্যে 'শনিবারের চিঠিতে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়। অন্যগুলি 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' এবং 'অলকা' প্রভৃতি হইতে পুনর্মুদ্রিত। আর একটি কথার উল্লেখ এখানে আবশ্যক; প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে লিখিত বলিয়া একত্র সমাবেশে বহুস্থলে পুনরুক্তিদোষ লক্ষিত হইবে। আশা করি, পাঠকবর্গ তাহা ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

শ্রদ্ধেয় গিরীন্দ্রবাবুর সহিত প্রবন্ধগুলির বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার উপদেশ লাভে কখনও বঞ্চিত হই নাই, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে তিনিই আমার শিক্ষাগুরু। প্রচলিত কথা অনুসারে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানানো বোধ হয়

আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা না করিয়া আমি তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি। সুবলবাবুর জোর তাগিদ না থাকিলে কতদূর অগ্রসর হইতাম বলিতে পারি না। তাঁহাকে এবং সজনীবাবুকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু একজনের সাহায্য না পাইলে পুস্তক প্রণয়ন কখনই শেষ হইত না, ইহা নিশ্চিত। তাহার কথাই এবার বলি। সে আমার স্নেহভাজন ছাত্র, অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনো-বিদ্যা বিভাগের রিসার্চ স্কলার শ্রীমান সরোজেন্দ্রনাথ রায় এম. এস-সি.। তাহার কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও সে নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন বহুদূর হইতে আসিয়া প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়াছে, কোন দিন বিরক্তিপ্রকাশ করে নাই। মধ্যে মধ্যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমি উপকৃত হইয়াছি। তাহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আমার আর একটি ছাত্রী কুমারী রেণুকা সেন (অধুনা শ্রীমতী রেণুকা বরাট) এম. এ., বি. টি. এবং আমার কন্যা শ্রীমতী অলকা কিছুদিন আমায় সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের আমার আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

যতদূর সাধ্য সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক দিক অক্ষুন্ন রাখিয়া মনঃসমীক্ষণের কয়েকটি মূল তথ্যের বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর সফলকাম হইয়াছি জানি না। ছাত্রবৃন্দ এবং যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা যদি এই পুস্তক পাঠ করিয়া কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রাসপূর্ণিমা, ১৩৪৮

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

মানুষের মন ও তাহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানসমূহের আলোচনা এবং গবেষণার ধারায় যেমন একটি বিবর্ত্তন সহজেই লক্ষিত হয়, মনোবিদ্যা-চর্চ্চার ইতিহাস মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলেও সেইরূপ একটি ক্রমপরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতিশীল চিন্তাধারার সন্ধান আমরা পাইয়া থাকি। আদিম যুগে জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সময় চতুর্দ্দিকের আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার একমাত্র সম্বল ছিল—কল্পনা। স্বপ্ন, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেহ হইতে মনের পার্থক্য, মনের সূক্ষ্ম স্বরূপ, তাহার অসীম ক্ষমতা ও যাবতীয় বস্তুর উপর তাহার ভয়াবহ প্রভাব সম্বন্ধে সে যুগের লোক কত কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল, নৃতত্ত্ববিদেরা তাহার সন্ধান দিয়াছেন ও এখনও দিতেছেন। মধ্যযুগে প্রতীচ্যে মনের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়াই মনোবিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। মন-বিষয়ে যে তথ্যসমূহের তৎকালীন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য বজায় থাকিত, সেই তথ্যগুলিই শুধু সত্য বলিয়া বিবেচিত হইত, অন্য তথ্য সকল ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলিয়া প্রচারিত হইত এবং বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেওয়া হইত। ডারুউইনের বিবর্ত্তনবাদ প্রচারের পর প্রতীচ্যের ভাবরাজ্যে যে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল ও চিন্তাজগতে যে তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন। সে ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে আমরা এখনও আসিয়া পৌঁছাই নাই।

বিবর্ত্তনবাদ প্রচারের পর হইতে সমস্ত বিজ্ঞানের, সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-আলোচনার ধারারই আমূল পরিবর্ত্তন হইল। কার্য্যকারণ-সম্পর্ক আবিষ্কার করিবার একমাত্র উপায় যে অসীম ধৈর্য্যসহকারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা বুঝিলেন ও মানিয়া লইলেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া সকল জড়-বিজ্ঞানই দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। মনোবিজ্ঞান কিন্তু নানা কারণে ওই তাল বজায় রাখিয়া চলিতে পারিল না। অন্যান্য জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়গুলি যেমন যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষাকারীর পরীক্ষা করা চলে, মনোবিজ্ঞানের বস্তুটিকে কি সেইভাবে পরীক্ষা করা যায়?—ইহাই একটি সমস্যা হইয়া পড়িল। কয়েকজন অধুনাবিশ্ববিখ্যাত মনোবিদ্ তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যসমূহ, এবং কিরূপে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক হ্বিল্‌হেল্‌ম ভুণ্ড্‌ট এইরূপ পরীক্ষামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য লাইপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিলেন। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই মনোবিদ্যার প্রথম পরীক্ষাগার। তখন হইতে এই নূতন পন্থায় মনোবিদ্যার চর্চ্চা অগ্রসর হইতেছে। এক দিকে যেমন নূতন নূতন সমস্যার ক্রমাগত উদ্ভব হইতেছে, অপর দিকে তাহাদের সমাধানের জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ক্রমশ আবিষ্কৃত হইতেছে। ভুণ্ড্‌ট-প্রদর্শিত এই পথ অনুসরণ করিয়া মনোবিদ্যা যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু গত ষাট বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহাও ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, চরম ব্যাখ্যার ইহাই একমাত্র পন্থা নহে; কারণ ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে। এই পথে যাইলে এই অসম্পূর্ণতা-দোষ

হইতে যে মনোবিদ্যা কোন কালে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণও উপস্থিত হইয়াছে। তাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আজ নানাবিধ মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। এক এক জন ক্ষমতাশালী মনোবিদ্, তাঁহাদের নিজ নিজ উদ্ভাবিত 'ইজ্‌ম্' যে সব দুঃখ দূর করিতে সমর্থ, তাহা প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক দিকে যখন পরস্পরবিরোধী কতকগুলি মতবাদের সৃষ্টি হইয়া একটি অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তখন অন্য এক দিক হইতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কতকগুলি মহামূল্য নূতন তথ্যের সন্ধান মিলিল ও তথ্য অনুসন্ধানের অভিনব পথ দৃষ্ট হইল। বিজ্ঞান আলোচনার ধারায় বিবর্ত্তনবাদ যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ মনোবিদ্যার আলোচনাতেও এই নূতন তথ্যসমূহ পূর্ব্বাচরিত রীতির পরিবর্ত্তন করিয়া একটি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিল।

মনোবিদ্যা-চর্চ্চার ইতিহাসে এই যুগপ্রবর্ত্তক—সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড। তিনি চিকিৎসক ছিলেন। স্নায়বিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসা করিবার সময় তিনি মানব-মনের কার্য্যাবলীর ধারা সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসমূহ প্রথমে মানসিক রোগ প্রতিকারের সহায়ক নূতন আবিষ্কার বলিয়াই তিনি মনে করেন, এবং জনসাধারণও সেই ভাবেই সেগুলি গ্রহণ করেন। পরে যখন উপলব্ধি হইল যে, সুস্থ-সবল-মনবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ওই তথ্যসমূহ সমভাবে প্রযোজ্য, তখন ফ্রয়েড-আবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণ মনোবিদ্যা-চর্চ্চারই রূপান্তর বলিয়া পরিগণিত হইল। এই পর্য্যন্ত পড়িয়া রূপান্তর যত সহজে হইয়াছিল বলিয়া মনে হইবে, আসলে কিন্তু তাহা হয় নাই। ফ্রয়েডকে প্রতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত বিরোধ করিতে হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কারগুলি এতই অভিনব, চিরাভ্যস্ত চিন্তাপ্রণালীর সহিত এতই

সামঞ্জস্যবিহীন ও চিরাচরিত সামাজিক রীতি ও নীতিবাদের এতই বিরোধী যে, লোকে তাঁহাকে নানারূপ অশ্লীল অপবাদ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। কিন্তু কেবল সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসে যে ভাবে ফ্রয়েড একাকী নানারূপ বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া অশেষ ধৈর্য্যসহকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহা চিরদিন জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। সত্যনিষ্ঠা, সত্যসাধনা এবং আজীবন একাগ্রমনে সত্যানুসন্ধান যত দিন মানব-জীবনের অন্যতম আদর্শরূপে বিবেচিত হইবে, ফ্রয়েডের নাম তত দিন মানবতার ইতিহাসেও জাজ্বল্যমান থাকিবে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চেকো-স্লোভাকিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়া প্রদেশে ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্নায়বিক ও মানসিক রোগ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কৌতূহল জাগ্রত হয়। সম্মোহনবিদ্যার সাহায্যে কিরূপে মানসিক ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য ফরাসী দেশের বিশ্वবিখ্যাত সারকোর নিকট যাইয়া কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াই চিকিৎসা করিতেন। ব্রয়ার নামে একজন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত চিকিৎসক এই সময়ে একটি হিষ্টিরিয়া-রোগ-গ্রস্তা কুমারীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, যখন সম্মোহনের সাহায্যে রোগীকে তাহার অতীত জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়, তখন সে কিছুকাল সুস্থ থাকে। তিনি এই রোগিণীর মনের গতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সহিত মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতেন। ফ্রয়েডও তাঁহার নিজের চিকিৎসাধীন হিষ্টিরিয়া-রোগীদের

মনের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দুইজনের অভিজ্ঞতা একরূপ হওয়াতে উভয়ে মিলিয়া হিষ্টিরিয়া সম্বন্ধে নূতন একটি তথ্যের সন্ধান দিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। ফ্রয়েড এই রোগীদের বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মানসিকতা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন যে, মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অবদমিত কাম-ইচ্ছা ও কাম-জীবন তাহাদের রোগের লক্ষণসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। তাঁহার এই উপলব্ধি যখন ব্যক্ত করিলেন, তখন সকলেই, এমন কি ব্রয়ার পর্য্যন্ত, বিমুখ হইলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ফ্রয়েড যে সূত্র পাইয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ করিতে বিরত হইলেন না। চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিলেন, সামাজিক নেতারা তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলেন। দীর্ঘ দশ বৎসর কাল তাঁহার এই ভাবে কাটিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনি মনঃসমীক্ষণ-পন্থা আবিষ্কার করেন, মার্জ্জিত করেন ও উহার সাহায্যে মনোজগতের গভীর রহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটিত করেন। দশ বৎসর পরে জুরিক শহরে চিকিৎসক ইয়ুঙ্গ্‌ তাঁহাকে জানান যে, সুইজারল্যাণ্ডের হাসপাতালে ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত পন্থা অবলম্বন করা হয়। এই সূত্রে ইয়ুঙ্গ্‌ এবং ফ্রয়েডের মধ্যে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে, এবং শীঘ্রই একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের অধিষ্ঠান হয়। ইয়ুঙ্গ্‌ তাহার সভাপতি হন। যে যে দেশে চিকিৎসকগণ মনঃসমীক্ষণকে মানসিক রোগ চিকিৎসার একটি ন্যায্য উপায় বলিয়া মনে করেন, সেই সেই দেশে একটি করিয়া সমিতি গঠনের কল্পনা করা হয়। ভিয়েনা শহরে যে সভা স্থাপিত হয়, অ্যাড্‌লার তাহার প্রথম সভাপতি হন। আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি হইতে স্ট্যান্‌লি হল ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ্গ্‌কে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার

জন্য আমন্ত্রণ করেন এবং বক্তৃতার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধিতে উভয়কে ভূষিত করেন। ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মনঃসমীক্ষণ বিস্তারলাভ করিতেছে। আজ এই সুদূর ভারতবর্ষেও একটি সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচারে সহায়তা করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও মনঃসমীক্ষণকে তাঁহার পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রয়ারের সহিত ফ্রয়েডের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, দশ বৎসর একাকী কাজ করিবার পর প্রথমে যাঁহারা ফ্রয়েডের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন ও ফ্রয়েডকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উভয়েই অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে ফ্রয়েডকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কষ্ট ও অপমান তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অ্যাড্‌লার এখন মৃত। ইয়ুঙ্গ্ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরস্পর কথাবার্ত্তার সময়ে ফ্রয়েডের নিন্দা করিতে তিনি সর্ব্বদাই শতমুখ। ইহা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা। তিনি এখানে অবস্থানকালে অসুস্থ হইয়া প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে কয়দিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, সে কয়দিনই তিনি তীব্র নিন্দাবাদ ও নানারূপ ইঙ্গিত সহকারে ফ্রয়েডের সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েডের সমস্ত লেখার মধ্যে কোথাও ইয়ুঙ্গ্ সম্বন্ধে ওইরূপ শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য দেখি নাই। ইয়ুঙ্গের মতদ্বৈধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আছে, কিন্তু চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবার চেষ্টা কোথাও নাই। বরং মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি যে দান করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত ফ্রয়েড তাহা নানা লেখার মধ্যে বার বার স্বীকার করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া ইহুদীবিদ্বেষবশত ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮২

বৎসর বয়সে ফ্রয়েডকে তাঁহার আজীবনের কর্ম্মস্থল ভিয়েনা শহর ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে অতি কষ্টে লণ্ডনে লইয়া গিয়া তথায় বাসের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার শেষ পুস্তক তথা হইতে প্রকাশিত হইল, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইল; ২৪এ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রবিবার তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

মানসিক রোগের প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণ-পন্থা আবিষ্কার করেন। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে মনের সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান, নির্জ্ঞান প্রভৃতি স্তরের সন্ধান পান এবং প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা লক্ষ্য করেন। নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আবিষ্কারগুলি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার এই নির্জ্ঞানের আবিষ্কার কোপার্‌নিকাসের এবং ডার্‌উইনের আবিষ্কারের সহিত তুলনীয়। এই আবিষ্কারের সাহায্যে আজ আমরা শুধু রোগীর মন নয়, সহজ সুস্থ মানবের মানসিকতার গতিবৃত্তি, সাহিত্য-ললিতকলার সৃষ্টিতত্ত্ব, সামাজিক রীতিনীতির অন্তর্নিহিত উৎস, ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তি, বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রমের বিভিন্ন নিয়মাবলীর কারণ, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব বলিয়া ভরসা করি। আজ মনে স্বতই এই দুঃখ জাগিতেছে, যিনি আজীবন সাধনা দ্বারা এই মনঃসমীক্ষণ-পন্থা আমাদের প্রদর্শন করিলেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সে শুধু জাতিগত কারণে নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া, স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তিনি কি জানিতেন যে, প্রবাসেই তাঁহার জীবতারা খসিয়া যাইবে? তাঁহার দেশ কি তাঁহাকে মনে করিয়া রাখিবে? আমরা এই কথাই জানাইতে চাই, তাঁহার দেশ তাঁহাকে মনে করিয়া না রাখিলেও সমস্ত পৃথিবীতে বহু আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি গভীর কৃতজ্ঞতার

সহিত তাঁহাকে স্মরণ রাখিবে। বহু সত্যানুধ্যায়ী পণ্ডিত তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। দিনে দিনে মনঃসমীক্ষণের বিস্তার বহু বিষয়ে এবং বহু দেশে হইতে থাকিবে এবং উহার ব্যবহারে সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে।

সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

মনঃসমীক্ষণ বা Psycho-analysis বিজ্ঞানজগতের একটি আধুনিক আবিষ্কার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও পর্য্যন্ত বিষয়টি সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশসমূহে চলিতেছে। আমাদের দেশে আমাদের ভাষায় বোধ হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর "স্বপ্ন" সম্বন্ধে প্রবন্ধসমূহ সাময়িকপত্রিকায় প্রকাশিত হইবার সময় হইতেই এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম সূত্রপাত হয়। সে বেশিদিনের কথা নয়। তবে এ বিষয়ে যেসব লেখকেরা বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বা গল্প নাটক প্রভৃতিতে বিষয়টির অবতারণা করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ইংরেজী সাইকো-অ্যানালিসিস কথাটিই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। তাই সাধারণের নিকট মনঃসমীক্ষণ কথাটি নূতনই থাকিয়া যাইতেছে ও কথাটির একটি সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ সহজভাবে গড়িয়া উঠিতেছে না। কিন্তু ব্যাপারটি সম্বন্ধে আলোচনা যখন আমাদের ভাষায় আরম্ভ হইয়াছে এবং ধরিয়া লওয়া যায়, ভবিষ্যতে আরও বিশদভাবে হইবে, তখন প্রথম হইতেই মনঃসমীক্ষণ কথাটি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। অনেক দিক হইতে বিচার করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতি সাইকো-অ্যানালিসিসের প্রতিশব্দরূপে এই কথাটিই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা

করিয়াছেন। মানসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের একটি বিশেষ পন্থা অনুসরণ করা হয় বলিয়া মনবিকলন, মনবিশ্লেষণ প্রভৃতি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য কথাগুলি অপেক্ষা মনঃসমীক্ষণ কথাটি ব্যবহার করাই সমীচীন।

এখন বিষয়টি কি, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। কিরূপ ভাবে বিষয়টি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাব কিছু আলোচনা করিলে জিনিসটি বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে। কারণ মনঃসমীক্ষণ বলিতে আমরা যে সমস্ত তথ্য বুঝি, সেগুলি হঠাৎ একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই। একটি তথ্য আর একটির নির্দ্দেশ দিয়াছে, সেটি আবার অন্য দিকে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। এই ভাবে ক্রমশ ক্রমশ অল্পে অল্পে জিনিসটি গড়িয়া উঠিয়াছে। অসীম ধৈর্য্যের সহিত শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কোনওমতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া ফ্রয়েড এই অনুসন্ধানে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই মনঃসমীক্ষণের সমস্ত মূল ভিত্তিগুলি তিনিই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফ্রয়েড চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়ন শেষ করিয়া ভিয়েনা শহরে ব্যবসা আরম্ভ করেন। প্রথম হইতেই শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাতেই তাঁহার আগ্রহ বেশি ছিল। সেকালে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার বিধি-ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না। চিকিৎসকেরা বৈদ্যুতিক চিকিৎসা, সংবেশন (hypnotism) প্রভৃতি কয়েকটি অনুমোদিত প্রণালীর সাহায্য লইতেন। ফ্রয়েডও প্রচলিত পন্থারই অনুসরণ করেন। কিন্তু ওই সমস্ত প্রণালীর অনুপযুক্ততা অনুভব করিয়া প্রথমেই বৈদ্যুতিক চিকিৎসা-প্রণালী পরিত্যাগ করেন। সে সময়ে যোসেফ ব্রয়ার নামে একজন প্রাচীন বিচক্ষণ চিকিৎসক ভিয়েনা শহরে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতেন। বয়সে অনেক ছোট হইলেও ফ্রয়েডকে ব্রয়ার যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও তাঁহার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। মানসিক

ব্যাধির কার্য্যকরণ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে প্রায়ই নানারূপ আলোচনা হইত।

একটি হিষ্টিরিয়া-রোগাক্রান্ত অবিবাহিতা যুবতীর চিকিৎসা করিবার সময় কয়েকটি নূতন ঘটনাবলীর দিকে ব্রয়ারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, রোগিণীর রোগের লক্ষণসমূহ (symptoms) তাহার অতীত জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট। ঘটনাগুলি অতীতকালে প্রবল প্রক্ষোভসমূহের (emotions) সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কারণবশত সে ভাবসমূহ সহজভাবে প্রকাশ পায় নাই। সেই অবরুদ্ধ প্রক্ষোভসমূহকে কথাবার্ত্তার ছলে প্রকাশিত হইবার সুযোগ ব্রয়ার করিয়া দিলেন। রোগলক্ষণসমূহ অন্তর্হিত হইয়া গেল ও রোগিণী আরোগ্যলাভ করিল। সুতরাং অতীত জীবনের রুদ্ধ প্রক্ষোভসমূহ হিষ্টিরিয়া-রোগের কারণ—ব্রয়ারের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিল। ফ্রয়েডও হিষ্টিরিয়া-রোগাক্রান্তদিগের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া ব্রয়ারের ধারণার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। উভয়ে মিলিয়া তখন হিষ্টিরিয়া-রোগ সম্বন্ধে নূতন তথ্যের ও রোগ আরোগ্য করিবার নূতন পন্থার সন্ধান দিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। হিষ্টিরিয়া-রোগীরা তাহাদের অতীত জীবনের রুদ্ধ ভাবরাশির অত্যাচারে প্রপীড়িত, সুতরাং তাহাদের আরোগ্যের উপায় হইতেছে—সেই রুদ্ধ ভাবরাশিকে মুক্ত হইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া। এই চিকিৎসা-প্রণালীর নাম দেওয়া হইল 'বিরেচন' (Catharsis)।

নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ফলও মন্দ হইতেছিল না। কিন্তু শীঘ্রই কয়েকটি অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমত কথাবার্ত্তাচ্ছলে অতীত জীবনের স্মৃতি সকল রোগীর মনে আসে না। উহা পুনরায় জাগ্রত করিবার জন্য ফ্রয়েড

সংবেশনের সাহায্য লইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুফল পাওয়া গেল না, অসুবিধা রহিয়াই গেল। কারণ সংবেশনের সাহায্যে সকলকে অভিভূত করা যায় না। আরও একটি ভাবিবার কথা। "রুদ্ধ ভাবরাশি" —ভাবরাশি কেন রুদ্ধ হয়, কেন সহজভাবে সব সময় প্রকাশ পায় না, এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ থাকিয়া জট পাকাইয়া রোগ সৃষ্টি করিবার কি কারণ হইতে পারে? এই সমস্ত সমস্যা ফ্রয়েডকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল।

সংবেশন-প্রণালীর অসুবিধা ও কিরূপে সে অসুবিধা অতিক্রম করা যাইতে পারে—এই বিষয়ে ভাবিবার সময়ে বিখ্যাত সংবেশক (hypnotist) বার্নহাইম-(Bernheim)-এর কথা ফ্রয়েডের মনে পড়িল। বার্নহাইম এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলে সংবিষ্ট অবস্থার বিস্মৃত স্মৃতি জাগ্রত অবস্থাতেও পুনরায় স্মৃতিপথে ফিরাইয়া আনা যায়। ফ্রয়েডের মনে হইল, তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে সাধারণ অবস্থার বিস্মৃত ঘটনার কথাই বা ফিরাইয়া আনা যাইবে না কেন? কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহা সম্ভব হয়, তাহা পরীক্ষা করিতে করিতে ফ্রয়েড অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association) পন্থা আবিষ্কার করিলেন। এই প্রণালীর প্রয়োগের ধারা কতকটা এইরূপ। রোগীকে একটি নির্জ্জন স্বল্পান্ধকার ঘরে, যেখানে চিকিৎসক এবং রোগী ভিন্ন অন্য কেহ উপস্থিত থাকিবে না, লইয়া গিয়া আরামে বসিতে বলা হয়। তাহার পর তাহাকে বলা হয়, "তোমার মনকে একেবারে ছাড়িয়া দাও, অর্থাৎ যাহা কিছু মনে আসিবে, কিছু বাদ না দিয়া সব বলিয়া যাও। এ কথা অপ্রাসঙ্গিক বা এ কথা তুচ্ছ বা ইহা অশ্লীল বা অন্যায়—এ রকম কোন বিচার করিবে না। নির্ব্বিচারে সমস্ত বলিয়া যাও।" এই রকম অবস্থায় থাকিয়া রোগী যে সমস্ত কথা ব্যক্ত করে, সেইগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করিলে রোগীর

অতীত জীবনের অনেক বিস্মৃত ঘটনাবলীর কথা জানা যায়, এবং তাহাদের মধ্যে নিহিত রোগের গুপ্ত কারণও চিকিৎসকের নিকট ধরা পড়ে। এই প্রণালী অনেক মানসিক রোগীর প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য এবং ইহাতে রোগীকে ঘুম পাড়াইবার প্রয়োজন হয় না। সংবেশন-প্রণালী অপেক্ষা ইহা অধিক কার্য্যকরী। এই উপায় আবিষ্কারের পর ফ্রয়েড সংবেশনের সাহায্যে লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করিলেন এবং এই সময় হইতেই তিনি নিজ উদ্ভাবিত নূতন প্রণালী অনুসারে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ব্রয়ার-প্রবর্ত্তিত 'বিরেচন'-প্রণালী হইতে এই প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফ্রয়েড ইহার নাম দিলেন—Psycho-analysis, ইহাকেই আমরা মনঃসমীক্ষণ বলিতেছি। মনঃসমীক্ষণ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতেই ব্রয়ার ও ফ্রয়েড উভয়ের পন্থা চিরকালের জন্য বিভিন্ন হইয়া গেল।

কি কারণে উভয়ের মনান্তর ঘটিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা মনঃসমীক্ষণের আর একটি তথ্যের নির্দ্দেশ পাইব। হিষ্টিরিয়া-রোগের চিকিৎসাকালে উভয়েই দেখিয়াছিলেন যে, এই রোগের লক্ষণগুলি যদিও আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহারা নিরর্থক নয়। তাহারা রোগীর কোন বিস্মৃত অবরুদ্ধ ভাবকে বিকৃত উপায়ে প্রকাশ করে, বাসনাকে চরিতার্থ করে। সেই অবরুদ্ধ ভাবসমূহকে সহজভাবে প্রকাশ করিবার উপায় করিতে পারিলে রোগী আরোগ্যলাভ করে। কিন্তু সেই অবরুদ্ধ মানসিক ব্যাপারগুলির স্বরূপ কি, সে বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ব্রয়ার প্রয়োজন মনে করিলেন না, ফ্রয়েড তাহা করিলেন।

উপরন্তু এই অনুসন্ধানের ফলে ফ্রয়েড যাহা আবিষ্কার করিলেন, ব্রয়ার তাহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিজের

মানসম্ভ্রমের খাতিরে অবিলম্বে ফ্রয়েডের সাহচর্য্য ত্যাগ করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন। ফ্রয়েডের মনে যথেষ্ট আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু তিনি যে সূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ করিতে বিরত হইলেন না।

তিনি দেখিয়াছিলেন যে, রোগীদের এই অবরুদ্ধ ভাবচিন্তা প্রভৃতি প্রায়শই তাহাদের কামজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। এরূপ একটি তথ্যাবিষ্কারের জন্য ফ্রয়েড একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজেও সাতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন ও ইতস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন অধিকাংশ রোগীর মধ্যে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, তখন আর ইহা স্বীকার না করিবার কোন উপায় রহিল না। জোর করিয়া এই সত্য প্রকাশ করিবার পর শুধু ব্রয়ার কেন, আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বিদ্বৎমণ্ডলী ফ্রয়েডের সংসর্গ ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার মনঃসমীক্ষণকে একটি অতীব বিপজ্জনক ও বীভৎস ব্যাপার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সমাজে একঘরে হইয়া থাকা যে আদৌ সুখের নয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিদ্বৎসমাজে অস্পৃশ্য হইয়া থাকা একজন তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যে বিশেষ কষ্টকর, কে তাহা না স্বীকার করিবে? কিন্তু এ কষ্ট সহ্য করিয়াও ফ্রয়েড একাকী তাঁহার পথে অগ্রসর হইলেন। দেখা যাউক, তিনি আর কি তথ্যের সন্ধান পাইলেন।

অবাধ ভাবানুষঙ্গ-প্রণালী প্রয়োগ করিবার সময় ফ্রয়েড দেখিলেন যে, রোগীরা অনেক সময় চুপ করিয়া থাকে, বলে, কিছু মনে পড়িতেছে না; অনেকক্ষণ পরে হয়তো আবার কিছু বলিল। বেশ দেখা যায়, কি যেন একটা বাধা জোর করিয়া রোগীকে তাহার অতীত জীবনের স্মৃতি মনে আনিতে দিতেছে না। রোগী সেই বাধার বিষয় একেবারেই সচেতন

নয়। কিন্তু সেই বাধার শক্তি তাহার কার্য্য ঠিকই করিতেছে। এই বাধার শক্তি হ্রাস করিতে পারিলে, তবেই বিস্মৃত ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমরা যে অনেক ঘটনার কথা ভুলিয়া যাই, তাহার একটি কারণ হইতেছে যে, সেগুলি জোর করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং মনের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা একটি বিষয় জানিলাম যে, বাধাশক্তি প্রয়োগ করিয়া মনের কতকগুলি ঘটনাকে মনই দমন করিয়া রাখে, স্মৃতিপথ হইতে সরাইয়া রাখে। এই শক্তির কার্য্য সম্বন্ধে কিন্তু আমরা সচেতন নই। ফ্রয়েড এই শক্তির নাম দিলেন—প্রতিবন্ধ (resistance) এবং শক্তিবলে নিরুদ্ধ হওয়াকে বলিলেন—অবদমন (repression)।

কিন্তু অবদমন-ব্যাপার আদৌ সংঘটিত হয় কেন? কি ধরনের চিন্তা বাসনা প্রভৃতি অবদমিত হয়? অনুসন্ধানের ফলে এ প্রশ্নের উত্তরও মিলিল। যাহা অবদমিত হয়, তাহা হয় লজ্জাকর, ভীতিপ্রদ, বিরক্তিকর কিংবা ওই ধরনের অপ্রীতিকর কিছু। নিজের সম্বন্ধে নিজের যে ধারণা আমরা পোষণ করি, তাহার সহিত খাপ না খাওয়াটাই ভাববিশেষ, চিন্তা ও অন্যান্য মানসিক ঘটনার অবদমিত হইবার একটি প্রধান কারণ। সভ্যসমাজে কামবিষয়ক চিন্তা ভাব প্রভৃতি অবদমিত হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাই প্রতিবন্ধ দূরীভূত করিলে আমরা প্রায়ই কামঘটিত চিন্তা প্রভৃতিরই সাক্ষাৎকার লাভ করি। কিন্তু কামসংক্রান্ত এই কথা বলিলেই অবদমিত মানসিক ব্যাপারের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। শৈশব-জীবনের অভিজ্ঞতা কিরূপে এই অবদমিত ব্যাপারের সহিত মিশিয়া থাকে, পরে আমরা তাহার পরিচয় পাইব।

স্মৃতিপথে আসিবার পূর্ব্বে এই অবদমিত বিষয়সমূহ কোথায় অবস্থান করে? শারীরতত্ত্বের দিক হইতে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। ফ্রয়েড মনোবিদ্যার দিক হইতেই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা

করিলেন। এই চেষ্টাই ফ্রয়েডকে মনঃসমীক্ষণের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তির নিকট পৌছাইয়া দিল, সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান তথ্যের সন্ধান মিলাইয়া দিল। এক কথায় এই তথ্যকে নির্জ্ঞান মনের তথ্য বলা যাইতে পারে। নির্জ্ঞান মন ও তাহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ফ্রয়েডের এই নূতন আবিষ্কারগুলি মানুষের চিন্তাধারায় কিরূপ বিপ্লব আনিয়া দিয়াছে ও উহাদের প্রভাব ভবিষ্যতে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, তাহার সঠিক ধারণা করা এখনও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্জ্ঞান মন

পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক কালে মন সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা হয়, তাহার ধারা পূর্ব্বকালের আলোচনার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেকালে দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটল-(Aristotle)-এর যুক্তিশাস্ত্রের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় অগ্রসর হইতেন। বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ থাকিত না ও সেগুলিকে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা অতি অল্প সময়েই লক্ষিত হইত। লর্ড বেকন-(Lord Bacon)-এর নব্যন্যায়সূত্রসমূহ প্রকাশিত হইবার পর হইতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ধারার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এই সময় হইতে গবেষণার ব্যাপারে তথ্যের সৃষ্টি অপেক্ষা বাস্তব ঘটনাবলীর অধ্যয়নের মূল্যই যে অধিক, তাহা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক মাত্রেই তাঁহাদের নিজ নিজ আলোচনার ক্ষেত্রে এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভুণ্ড্ট্ (Wundt), ফেক্‌নার (Fechner) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া শীঘ্রই অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু এইভাবে মন সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান মিলিলেও অনেকেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, মানসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা থাকিয়াই যাইতেছে; এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় মনোবিদ্যা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

মন সম্বন্ধে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য যখন মনোবিদ্‌গণ বিভিন্ন প্রয়োগশালা-(laboratory)-য় নানারূপ পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য এক দিক হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া পড়িয়া বহু সমস্যা সমাধানের পথ আলোকিত করিয়া দিল। এই আলোকপাত করিলেন ফ্রয়েড। তিনি মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসাপ্রণালীর উন্নতি করিবার জন্য নানারূপ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলেই তিনি মনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বহুবিধ অভিনব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আবিষ্কার করিলেন। যে সমস্ত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ঘটনাবলীর দিকে তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন, সেগুলি এ পর্য্যন্ত সকল মনোবিদেরই দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। মনঃসমীক্ষণ বলিতে আমরা যে শুধু তাঁহার প্রবর্ত্তিত মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার নূতন প্রণালীকেই বুঝি, তাহা নহে। মন সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত এই সকল নূতন ঘটনাবলী ও তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল তথ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টিকে আমরা অনেক সময়ে 'মনঃসমীক্ষণ' আখ্যা দিয়া থাকি। অধুনা 'মনঃসমীক্ষণ' কথাটি অধিকতর ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শুধু যে ব্যাধিগ্রস্ত মনের সম্বন্ধেই ফ্রয়েডের তথ্যগুলি প্রযোজ্য, তাহা নহে; সাধারণ সুস্থ মনের কার্য্যকলাপ যখন আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তখন এই সমস্ত সূত্রেরই সন্ধান পাই। মনঃসমীক্ষণকে তাই এখন মনোবিদ্যা-চর্চ্চারই একটি বিশেষ পন্থা বা সমগ্র মনোবিদ্যা-(Psychology)-রই একটি বিশেষ রূপান্তর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন অর্থে মনঃসমীক্ষণ কথাটি ব্যবহৃত হইলেও, কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে কি ভাবে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা একটু মনোনিবেশ করিলেই সহজে অনুমিত হইবে। সুতরাং অর্থবোধের অসুবিধা বোধ হয় কোথাও হইবে না।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, নির্জ্জান মনের তথ্যই মনঃসমীক্ষণের প্রধান ভিত্তি। এখন এই নির্জ্জান মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে ফ্রয়েড কিরূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহার বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক। খুব ব্যাপকভাবে ধরিতে গেলে নির্জ্জান মানসিক ঘটনা বলিতে আমরা এমন ঘটনা বুঝি, যাহা এক সময়ে আমাদের সংজ্ঞান-(consciousness)-এ ছিল, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে নাই। কিন্তু যাহা উপস্থিত সংজ্ঞানে নাই, তাহা যে এক সময়ে সংজ্ঞানে ছিল, তাহার প্রমাণ কি, তাহা আমরা ধরিয়া লই কেন? প্রমাণ এই যে, একটু চেষ্টা করিলেই সেই পূর্ব্ব ঘটনা পুনরায় সংজ্ঞানে আনা যায়। পাঠক-পাঠিকাদের অতীত জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে, কিন্তু সব ঘটনাই এই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সংজ্ঞানে নাই। একটু চেষ্টা করিলে অনেক অতীত ঘটনার কথা তাঁহারা মনে করিতে পারেন, অর্থাৎ সংজ্ঞানে আনিতে পারেন। সুতরাং যাহা উপস্থিত সংজ্ঞানে নাই, তাহা যে এক সময়ে সংজ্ঞানে ছিল এবং উপস্থিত নির্জ্জানে আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নহে।

অধুনা নির্জ্জান কথাটি কিন্তু এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আরও সীমাবদ্ধ এবং বিশিষ্ট অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়। মনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি সুসঙ্গত ধারণা করিবার পক্ষে সহায়তা করে বলিয়া মনঃসমীক্ষকেরা (Psycho-analysts) আজকাল মনের তিনটি স্তরের কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথম, সংজ্ঞান স্তর,—যে সমস্ত মানসিক কার্য্যাবলী ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমাদের মনকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, সেইগুলি মনের সংজ্ঞান স্তরে আছে বলিয়া আমরা কল্পনা করি। ধরিয়া লইতেছি, আপনি মনোযোগ সহকারে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং তৎসংক্রান্ত বহু চিন্তা

এবং ভাব প্রভৃতি এই মুহূর্ত্তে আপনার মনে জাগরূক রহিয়াছে। আমাদের পরিভাষায় বলিব যে, ঐ সমস্ত চিন্তা ভাব প্রভৃতি আপনার মনের সংজ্ঞান স্তরে আছে। যে সমস্ত ঘটনার কথা ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমাদের সংজ্ঞানে নাই, অথচ একটু চেষ্টা করিলেই পুনরায় সংজ্ঞানে আনিতে পারা যায়, সেগুলি মনের দ্বিতীয় স্তরে আছে বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের নাম আসংজ্ঞান (preconscious)। যেমন, গতকল্য এই সময়ে আপনি কি করিয়াছিলেন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে আপনার মনে নাই, কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই মনে করিতে পারেন। সুতরাং এই ঘটনা আপনার আসংজ্ঞান স্তরে ছিল। এইরূপ ভাবে চেষ্টা করিলে অনেক পুরাকালের কথা, এমন কি অতি শৈশবের কথাও আপনি মনে করিতে পারেন। এই আসংজ্ঞান স্তর পূর্ব্বে নির্জ্ঞান স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এখন ইহাকে নির্জ্ঞান স্তর হইতে পৃথক একটি স্তর বলিয়া মনে করা হয়। এইরূপে নির্জ্ঞান কথাটির অর্থের ব্যাপকতার হ্রাস হওয়াতে আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বে নির্জ্ঞান স্তর বুঝাইবার জন্য যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল, বস্তুত তাহা আসংজ্ঞান স্তরেরই উদাহরণ।

অধ্যবসায় ও গভীর মনোযোগ সহকারে চেষ্টা করিলে, অতীত জীবনের প্রত্যেক ঘটনার স্মৃতি সংজ্ঞানে আনিতে পারা যায় কি না, ইহা একটি কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা। দৈনিক সংবাদপত্রে আজকাল মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোন একটি অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা তাহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছে এবং সেই সমস্ত কথার সত্যতাও নাকি প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ জাতিস্মর ব্যক্তিদিগের বা অসামান্য মহাপুরুষদের স্মৃতিশক্তি-বিষয়ে আমরা আলোচনা করিব না।

সাধারণ মানবের পূর্ব্বজন্মের কথা দূরে থাকুক, এই জন্মেরই অতীত কালের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। বরং এইরূপ ক্ষমতার অভাবই আমরা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। বাল্যকালের অনেক ঘটনার কথাই যে মনে থাকে না, এ বিষয়ে সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে। জোর করিয়া এ কথা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না। বাল্যকালের এই বিস্মৃত ঘটনাবলীর মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ণিত আসংজ্ঞান স্তরে আছে বলা যায়, অর্থাৎ একটু চেষ্টা করিলেই আমরা সেগুলি পুনরায় মনে করিতে পারি। আবার অনেক ঘটনা আছে, যাহা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা মনে করিতে পারি না। অথচ এই সমস্ত ঘটনা যে ঘটিয়াছিল, তাহার স্বপক্ষে এমন সমস্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণ বর্ত্তমান থাকে যে, ঘটনাগুলির সত্যতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। যেমন, আমার এক বন্ধুর চিবুকে একটি ক্ষতের দাগ আছে। বাল্যকালে খেলা করিতে করিতে খাট হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার চিবুক কাটিয়া যায় এবং প্রচুর রক্তপাত হয়। সেই সময় হইতেই দাগটি থাকিয়া গিয়াছে। এক দিকে যেমন ক্ষতের দাগটি সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্য দিকে তেমনই বন্ধুর মাতা ও ভগিনীর দাগটির সম্বন্ধে সাক্ষ্যও রহিয়াছে, অতএব খাট হইতে পড়িয়া গিয়া যে চিবুক কাটিয়া গিয়াছিল, ইহা বন্ধুর মনে না থাকিলেও অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। বন্ধুও ইহা মানিয়া লইতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করে না।

এখন আর এক প্রকার ঘটনার কথা বলি। শুধু বাল্যকালে কেন, জীবনের সকল অবস্থাতে, যে কোন সময়ে আমাদের মনে বহু চিন্তা ভাব ইচ্ছা প্রভৃতির উদ্রেক হয়, যাহার কথা আমরা কিছুতেই সংজ্ঞানে আনিতে পারি না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য

হই যে, এই সকল ব্যাপার আমাদের মনোরাজ্যে ঘটিয়াছিল। এই ধরনের মানসিক ঘটনাসমূহ—যাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না, অথচ যাহা কখনই সংজ্ঞানে আসে না—সেগুলি মনের যে স্তরে থাকে, সেইটি মনের তৃতীয় স্তর। মনঃসমীক্ষকেরা তাহাকে মনের নির্জ্ঞান স্তর বলিয়া বর্ণনা করেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমার যে সকল ইচ্ছা চিন্তা প্রভৃতির কথা আমি কোন কালেই অবগত হই না—কারণ তাহারা কখনও আমার সংজ্ঞানে আসে না—তাহাদের অস্তিত্বের কথা আমি স্বীকার করিয়া লইব কি প্রকারে? এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্তও বটে। আবার যদি এরূপ ইঙ্গিত করা হয় যে, এই সকল অজ্ঞাত ইচ্ছা বা চিন্তা প্রায়শই অসামাজিক বা নীতিবিরুদ্ধ, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইবার পথে বাধা তো আরও প্রবল হয়। কারণ তখন যুক্তির সহিত আসে আত্মাভিমান, এবং উভয় মিলিয়া জোর করিয়া বলিতে থাকে যে, এই সকল অজ্ঞাত বাসনা চিন্তা প্রভৃতির কথা সম্পূর্ণ অমূলক, উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ নাই। মনোবিদ্‌দের উহা একটি নিছক কল্পনামাত্র।

প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, মনের অজ্ঞাত বাসনা চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাহারও নাই, ফ্রয়েডেরও ছিল না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যে আমাদের একমাত্র সম্বল, তাহা নহে। জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যেই হউক অথবা দার্শনিক চিন্তারাজ্যে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেই হউক, সর্ব্বত্রই ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বিচার অনুমান প্রভৃতির একটি বিশিষ্ট স্থান সব সময়েই আছে, এবং ঐ সকলের মূল্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রমাণের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। বস্তুত

একটু চিন্তা করিলে সকলেই উপলব্ধি করিবেন যে, আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ অনুমিত ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি। রোগের লক্ষণ-সমূহ হইতে চিকিৎসকগণ প্রথমত অসুস্থতার কারণ অনুমান করিয়া লন। পরে তাঁহারা যে চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহা ওই অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অধ্বর (ether), পরমাণু (atom), বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (electric waves) প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন বৈজ্ঞানিকেরই নাই। তাঁহারা ওই সকলের স্বরূপ ও গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহা কিছু নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে সমস্তই পরোক্ষ অনুমানের ফল। মনও কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, কিন্তু আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। আমাদের এই বদ্ধমূল ধারণার ভিত্তিও পরোক্ষ অনুমান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে।

কার্য্যকারণবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক, কার্য্যমাত্রই যে কারণসম্ভূত, তাহা ধরিয়া লইয়াই আমরা তথ্যানুসন্ধানে রত হই। ভৌতিক জগতে বা মানসিক জগতে কোথাও অকস্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণে কোন ঘটনাই ঘটে না। ভূমিকম্পের কারণ ভূমণ্ডলের গর্ভে নিহিত থাকে, আমাদের গোচরে আসে না, তাই ভূমিকম্পকে আমরা আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিয়া ভুল করি। আপনার স্মৃতিপথে যে কথাটির হঠাৎ উদয় হইল বলিয়া মনে করিতেছেন, অনুসন্ধান করুন, দেখিবেন, তাহার এই আকস্মিক অভ্যুদয় বিনা কারণে ঘটে নাই। তবে ব্যাপারটি হইতেছে এইরূপ,—কার্য্যমাত্রেরই কারণ যে আমরা সব সময়ে অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে পারি, তাহা নয়। অনেক সময়ে ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া এবং বিধিসঙ্গত যুক্তি অনুমান প্রভৃতির

সাহায্যে কারণ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। যদি কল্পিত কারণ যথেষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যতদিন না অন্য কোনও প্রতিকূল ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আমরা দেখিব, মনের নির্জ্ঞান স্তরে বাসনা চিন্তা প্রভৃতির অস্তিত্ব ধরিয়া লইবার এই ধরনের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। প্রমাণ অবশ্য চিরকালই ছিল, ফ্রয়েডই প্রথমে সেগুলির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি

নির্জ্জান মনের অস্তিত্বের কল্পনা করিবার, তথ্যের দিক হইতে যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক এবং ন্যায়বিদ্‌দিগের নিকট তথ্যের মূল্য যত অধিকই হউক না কেন, কোন বিষয়ে প্রতীতি জন্মাইবার পক্ষে অমূর্ত্ত (abstract) তথ্য অপেক্ষা মূর্ত্ত (concrete) ঘটনাবলী যে সাধারণত অধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। ধরুন, নিউটনের 'মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব'। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট গুরুত্বের বস্তু একটি পরিমিত উচ্চ স্থান হইতে সোজাসুজি নীচে ফেলিয়া দিলে তাহা পৃথিবীর আকর্ষণের বিশেষ রীতি অনুসারে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাটিতে আসিয়া পড়ে। এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে দুর্ব্বোধ্য অঙ্কশাস্ত্রের সূক্ষ্ম গণনার ভিতর না যাইয়া দ্রব্যটি সেই উচ্চ স্থান হইতে কয়েকবার ফেলিয়া দিয়া, তাহা যে একই সময়ে মাটিতে পড়ে, ইহা দেখাইয়া দেওয়াই কি বিশেষ কার্য্যকারী হয় না? আবার দেখুন, তথ্য প্রায়শই নীরস হইয়া থাকে। তাই কেবলমাত্র তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয় কখনই তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। এইজন্যই বোধ হয় একজন চিন্তাশীল লেখক এক সময় বলিয়াছিলেন, শুধু বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয় গ্রহণ করিলে তাহা কখনই পুরাপুরিভাবে নিজস্ব করিয়া লওয়া যায় না (A thing grasped by the intellect is only half understood)। অতএব কিছুক্ষণের জন্য শুষ্ক এবং প্রাণহীন তথ্যের আলোচনা বন্ধ রাখিয়া জীবন্ত বাস্তব ঘটনাবলীর দিকে মনোযোগ দেওয়া যাউক।

এই প্রসঙ্গে দৈনিক কার্য্যসমূহে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি সাধারণত আমরা করিয়া থাকি ও আমাদের আচার-ব্যবহারে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সচরাচর হইয়া থাকে, সেইগুলি সম্বন্ধেই প্রথম আলোচনা করিব। আমরা অনেক সময় এক কথা বলিতে আর এক কথা বলি, এক লিখিতে আর এক লিখি, পড়িবার সময়ে যে কথা লেখা নাই তাহা পড়ি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও ভুল শুনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কতগুলি ভুল কাজ আমরা করি, সাময়িক বিস্মৃতি ভিন্ন যাহার অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেমন, অত্যন্ত পরিচিত কোন নাম প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও মনে করিতে পারিলাম না, কিন্তু পরে অপ্রত্যাশিতভাবে মনে পড়িয়া গেল। কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন বিশেষ কাজ করিবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু সময় যখন আসিল, কাজটির কথা একেবারেই মনে রহিল না। জিনিস-পত্র যেখানে সেখানে রাখার দরুন প্রয়োজনের সময় খুঁজিয়া না পাওয়া আর এক জাতীয় ভুল। এই সকল বিভিন্ন প্রকারের ভুল করার অভিজ্ঞতা যে আপনাদের সকলেরই কিছু না কিছু আছে, এ কথা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সাধারণত এই সকল ভুলের প্রতি আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না, এবং সেইজন্যই ইহারা আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণও করে না।

আপনারা হয়তো ভাবিতেছেন যে, নির্জ্জ্যান স্তরের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত তুচ্ছ কথার অবতারণা কেন? মনের সুষ্ঠু বিকাশ কি করিলে হয়, মানসিক ব্যাধির কারণ কি, প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ জটিল সমস্যা থাকিতে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যাপারের আলোচনায় লাভ কি? যাহা বাজে কথা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে এত আড়ম্বর সহকারে চর্চ্চা করিতে উদ্যত হওয়ার সার্থকতা কি?

যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ধরিয়া লইলাম, সে সবগুলি তুচ্ছ ব্যাপার, সামান্য ঘটনা। কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপার বা সামান্য ঘটনা বলিয়া কি তাহাদের কোন মূল্যই নাই? যে সকল ক্ষুদ্র ঘটনা আমরা সাধারণত একেবারে নিরর্থক, নগণ্য বলিয়া মনে করি, তাহাদের মধ্য দিয়াই কি অনেক সময় অনেক বিরাট তথ্যের সন্ধান মেলে না? বৃক্ষ হইতে আপেল পড়িয়া যাওয়া, জলপূর্ণ টবেতে (tub) স্নান করিতে নামিলে জল উপচাইয়া পড়া খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু ইহা হইতেই কি যথাক্রমে 'মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব' এবং 'আর্কিমিডিস সূত্র' (Archimedes principle) আবিষ্কৃত হয় নাই? একটু বিবেচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, এইরূপ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়াই কত সময় কত গভীর মনোভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। ক্ষণিকের সলজ্জ দৃষ্টি, অধরের কোণে অলক্ষ্যপ্রায় মৃদু হাসি যে আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করিতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে আপনারা নিশ্চয়ই দ্বিধা করিবেন না। আবার যখন কোন ডিটেক্‌টিভ কোন হত্যাবিষয়ে অনুসন্ধানে রত হন, তখন তাঁহাকে অতি তুচ্ছ জিনিসের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয় না কি? কাপড়ের কিংবা কাগজের সামান্য একটু ছিন্ন অংশ, পায়ের বা জুতার ক্ষীণতম চিহ্ন প্রভৃতি তাঁহার নিকট অত্যন্তই মূল্যবান। বৈজ্ঞানিক যখন কোন বৃহৎ সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হন, তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী লইয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হয়। অনেক সময় ইহাও দেখা যায়, সামান্য জিনিস লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক বৃহৎ সূত্রের সন্ধান পান। আশা করি, এখন আপনারা স্বীকার করিবেন, ঘটনা সামান্য এবং ক্ষুদ্র হইলেই যে সব সময়ে উপেক্ষণীয়, তাহা নহে। বরং সামান্য ঘটনা হইতে যে বৃহৎ তথ্যের সন্ধান মিলিতে পারে, এরূপ ভরসা

করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই ভরসার কথা মনে রাখিয়াই পূর্ব্ব-কথিত তুচ্ছ ভুল-ভ্রান্তির আলোচনায় আমরা অগ্রসর হইব।

মনোবিদ্ নন কিংবা মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করেন নাই, এমন কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, লোকে এই সব তুচ্ছ ভুল করে কেন, অন্য সব বিষয়ে প্রকৃতিস্থ (normal) হইয়াও কথা কহিবার সময় এক কথা বলিতে আর এক কথা বলে কেন, লিখিবার সময় এক কথা লিখিতে আর এক কথা লেখে কেন, তিনি হয়তো প্রথমেই বলিবেন, ও কিছু নয়, ও রকম হয়ে থাকে, ওর ভেতর জিজ্ঞেস করবার কি আছে? তিনি হয়তো আরও সন্দেহ করিবেন, যিনি এইরূপ অর্থহীন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, তাঁহার মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই সুবিধাজনক নহে। তাঁহাকে যদি আবার প্রশ্ন করা যায়, 'ও কিছু নয়' কথাটির অর্থ কি, 'ও রকম হয়ে থাকে' বলিতে তিনি কি বোঝেন যে, ভুল-ভ্রান্তিগুলি কোন কারণসম্ভূত নহে, বিনা কারণেই ঘটিয়া থাকে, তখন হয়তো তিনি একটু ইতস্তত করিয়া স্বীকার করিবেন, কারণ যে একেবারেই নাই তাহা নহে, তবে সে কারণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। লোকে যখন অন্যমনস্ক, ক্লান্ত বা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তখনই তাহারা এ রকম ভুল করে। এখন এই উত্তরটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় থাকিলে কোন কার্য্যে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করা যায় না। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় কার্য্য করার ফল এবং অন্যমনস্ক হইয়া কার্য্য করার ফল একই হইয়া থাকে। তাহা হইলে, ফলত এই কথাই দাঁড়াইল যে, এই সকল ভুলের একমাত্র কারণ অন্যমনস্কতা।

এক বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করিলে সেই সময়ে অন্য বিষয়ে যে নানারূপ ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

আমি শ্যামবাজার হইতে ট্রামে উঠিলাম, মানিকতলা স্পারে নামিবার কথা ; কিন্তু বন্ধুর সহিত সিনেমায় যে সমস্ত বাংলা ছবি সম্প্রতি দেখানো হইতেছে, সেই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে কখন যে মানিকতলা স্পার পার হইয়া গেলাম, খেয়াল রহিল না। যখন খেয়াল হইল, তখন ঠনঠনিয়ার মোড়ে গাড়ি থামিয়াছে। লাভের মধ্যে সেখান হইতে আমাকে হাঁটিয়া মানিকতলায় ফিরিতে হইল। অন্যমনস্কতাবশত অধ্যাপকদিগের নানাপ্রকার অসঙ্গত বাক্যপ্রয়োগ ও অসমঞ্জস ব্যবহারের অনেক কৌতুকপ্রদ গল্প আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। দাবা খেলিতে বসিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে "কাদের সাপ ছেলেকে কামড়েছে" জিজ্ঞাসা করিয়া বসার কথা—গল্প হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ ঘটনা যে বাস্তবজগতে একেবারেই ঘটিতে পারে না, তাহা নহে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বোধ করি আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। অন্যমনস্কতা-হেতু যে অনেক রকম ভুল-ভ্রান্তি ঘটিতে পারে, তাহা উপস্থিত মানিয়া লওয়া যাউক।

কিন্তু অনেক ভুল-ভ্রান্তি মনোযোগের অভাববশত ঘটে—এ কথা মানিয়া লইলেও সর্ব্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি কি এই তথ্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়? মনোনিবেশ করিলেই যে সব কার্য্য সঠিক সম্পন্ন করা যায় বা সব কথা যথাযথভাবে বলা যায়, তাহা কি সব সময়ে সত্য? এমন অনেক কার্য্য আমরা করিয়া থাকি, যেখানে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতে যাইলেই ভুল-ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। কোন কার্য্যে নিপুণতা অর্জ্জন করার অর্থই হইতেছে যে, সে কার্য্য সুসম্পাদিত হইবার পক্ষে মনের যোগের আদৌ প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, বাজাইবার সময় অঙ্গুলিচালনার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ একেবারেই থাকে না। আমাদের দৈনন্দিন

অভ্যস্ত কার্য্যগুলি মনঃসংযোগনিরপেক্ষ হইয়াও সুসম্পাদিত হইয়া যায়। সুতরাং নির্ভুলভাবে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইলে সেই কার্য্যে যে মনঃসংযোগ করিতেই হইবে—এ কথা সব সময়ে বলা চলে না। আবার মনঃসংযোগ সত্ত্বেও ভুল এড়াইতে পারিতেছি না, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। প্রয়োজনের সময় পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের নাম মনে করিতে না পারা একটি অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থা। গভীর মনোযোগের সহিত যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও নামটি কিছুতেই মনে আসে না—"পেটে আসে মুখে আসে না" অবস্থায় থাকিয়া যায়। একজনের নাম সম্বন্ধে একটি ভুল করিয়াছি। সতর্ক হইয়া ভুল সংশোধন করিতে যাইয়া আবার একটি ভুল করিয়া বসিলাম, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। লোকটির নাম সুরজিৎ। প্রথমে বলিলাম 'সুজিৎ', তারপর সংশোধন করিয়া বলিলাম 'রঞ্জিৎ'। মনঃসংযোগ সহকারে শোধরাইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভুল রহিয়া গেল।

অতএব দেখা গেল, দৈনন্দিন জীবনের সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি যে কেবলমাত্র অন্যমনস্কভাবশতই ঘটিয়া থাকে—এ কথা মানিয়া লওয়া যায় না। মনোযোগের অভাব ভুলের যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অন্য দিক হইতে অগ্রসর হইলে বোধ হয় আমরা এই সকল ভুল-ভ্রান্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। আমরা ভুল যে করিয়া থাকি এবং কি রকম অবস্থায় ভুল করি, এ পর্য্যন্ত শুধু সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু অন্য ভুল না করিয়া ঠিক ওই বিশেষ ভুলটি কেন করিলাম বা 'সুরজিৎ' বলিতে অন্য কিছু না বলিয়া 'সুজিৎ'ই বা কেন বলিলাম—এ সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করি নাই। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা দেখিব যে, এই ভুল-ভ্রান্তিগুলি যথোচিতভাবে ব্যাখ্যা করিতে নির্জ্ঞান তথ্য আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

মনোযোগ তথ্যের (Attention theory) দ্বারা সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তির যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ ধ্বনির সাদৃশ্যকেই একটি কথার পরিবর্ত্তে আর একটি কথা ব্যবহার করার কারণ বলিয়া মনে করেন। ধ্বনির সাদৃশ্য আছে বলিয়াই অনুষঙ্গ(association)বশত স্বরজিৎ বলিতে ভুলক্রমে সুজিৎ এবং রঞ্জিৎ বলা সম্ভব হইয়াছিল। ভাষাঘটিত সর্ব্বপ্রকার ভুল ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহারা বিনিময় (interchange), সংমিশ্রণ (compounding) প্রভৃতি আরও কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। 'পুখুজ্জেদের মুকুরধারে দাঁড় ষাঁড়িয়েছিল' এবং ফ্রয়েড একজন 'চিন্তাশ্লীল' (চিন্তাশীল+অশ্লীল) ব্যক্তি ছিলেন, যথাক্রমে এই দুইটি সূত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, অনুষঙ্গ প্রভৃতি তথ্যের দ্বারা ভাষাগত ভুলের ব্যাখ্যা আপাতন্যায্য মনে হইলেও সে ব্যাখ্যা বাস্তবিক সুচারু এবং সম্পূর্ণ নহে। বন্ধুবর সব সময়ে নামের গোলমাল করেন না, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তেই বা তাঁহার ভুল হইল কেন, অথবা আভা, প্রভা, নিভা প্রভৃতি নামগুলির 'বিভা' নামটির সহিত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি 'বিভা' বলিতে অন্য নামগুলির পরিবর্ত্তে শোভা নামটিই বা বলিলেন কেন, এ সকল প্রশ্নের কোনটিরই সদুত্তর এই তথ্য হইতে পাওয়া যায় না। শুধু তাহাই নহে। ভুল-ভ্রান্তির সাধারণ ব্যাখ্যা হিসাবে এই তথ্য মানিয়া লইবার পক্ষে আরও প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কারণ ভাষাঘটিত ভুল ভিন্ন অন্য কোন ভুল এই তথ্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, ভাষাঘটিত সকল প্রকার ভুলই এই তথ্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

একজন ছাত্র তাহার অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিল, সার্, কালকে কলেজ ছুটি না বন্ধ? তাহার অবশ্য জিজ্ঞাস্য ছিল, কলেজ খোলা না বন্ধ; কিন্তু 'খোলা'র পরিবর্ত্তে 'ছুটি' কথাটি সে ব্যবহার করিল কেন? ইহা কি শুধু ভাষাঘটিত ভুল? ভাষাতত্ত্বের মারপ্যাঁচ দিয়া এই ভুলের যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা যায় কি না, তাহা চিন্তার বিষয়। অধ্যাপক কিন্তু প্রশ্নের ধরন হইতে, ছাত্রের অন্তরে কি বাসনা ছিল, তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন হুঁ-উ-উ, কাল কলেজ ছুটিও নয়, বন্ধও নয়—খোলা।

বিচার করিয়া দেখিলে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের ব্যাখ্যা অপেক্ষা মনোযোগ তথ্যটি অধিকতর সঙ্গত ও উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। অন্তত ইহার ব্যাপকতা যে প্রথমোক্ত তথ্য অপেক্ষা অধিক, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বিভিন্ন দিক হইতে ভুলের সঙ্গত কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন বৈজ্ঞানিকই যে এ যাবৎ একটি যথেষ্ট ব্যাপক সূত্রের সন্ধান দিতে পারেন নাই, তাহা আমরা দেখিলাম। তবে কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আপাততুচ্ছ এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তিগুলি ব্যাখ্যা করিবার কোন উপায়ই নাই? উপায় যে আছে এবং সেই উপায় অবলম্বন করিলে সকল প্রকার ভুলেরই যে সঙ্গত ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন ফ্রয়েড প্রমুখ মনঃসমীক্ষকেরা। ইহাদের মতে কোন ভুলই বাস্তবিকপক্ষে নিরর্থক নহে। প্রত্যেক ভুলের দ্বারা ভ্রান্তের কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই উদ্দেশ্য সচরাচর আমাদের নজরে পড়ে না এবং ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই মনে জাগে না। কারণ ভুল করার সময় উদ্দেশ্যটি প্রায়শই নির্জ্ঞানে থাকে। এই অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া

মনঃসমীক্ষকেরা ভুল ব্যাখ্যার একটি নূতন পন্থা আমাদের দেখাইয়াছেন। এই দিক দিয়া ভুল সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সমাধান করিবার রীতিমত চেষ্টা ফ্রয়েডের পূর্ব্বে বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। এখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা মনে রাখিয়া কতকগুলি ভুল-ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হওয়া যাউক। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমেই ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইব। কতকগুলি ভুল সংঘটিত হয় প্রধানত আমাদের বিস্মরণের ফলে। সেগুলিকে আমরা (ক) বিস্মৃতি (forgetting) বলিব; যেমন—নাম ভুলিয়া যাওয়া প্রভৃতি। আবার কতকগুলি ভুল আমরা করিয়া থাকি, যেগুলির জন্য বিস্মরণ মূলত দায়ী নহে। সেগুলিকে আমরা শুধু (খ) ভুল (errors, mistakes) আখ্যা দিব; যেমন—এক কথা বলিতে আর এক কথা বলা ইত্যাদি।

(ক) বিস্মৃতি

আমাদের অতীত জীবনের কোন কোন ঘটনার কথা বিস্মৃত হইবার একটি প্রধান কারণ যে অবদমন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। অবদমন ব্যাপার আদৌ সংঘটিত হয় কেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছিল, যে সমস্ত ঘটনা মনে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, সাধারণত সেই সকল ঘটনাই অবদমিত হয়। বিস্মৃতি সম্বন্ধে সেই আলোচনার কথা, আশা করি, আপনারা এখনও বিস্মৃত হন নাই। বিস্মৃতি নানা বিষয়ক হইতে পারে। যেমন—নাম ভুলিয়া যাওয়া, কোন কাজ করিতে ভুলিয়া যাওয়া প্রভৃতি। এইরূপ কয়েকটি বিস্মৃতি সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যাউক।

১। **নাম ভুলিয়া যাওয়া**—সেদিন আড্ডায় রোজকার মত নানা বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। বিবাহে পণপ্রথা, মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন, সুভাষ বোস, হিন্দু মহাসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, রেডিও প্রোগ্রাম প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ রহিল না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়ার কথা আসিয়া পড়িল। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে সমস্ত খাওয়া শেষ হইয়া যাইবার পর কে কবে কত সের সন্দেশ বা দধি খাইয়াছেন বা কে কবে "আজ শরীরটা ভাল ছিল না, তাই মাত্র খান আঠারো রুটি খেয়ে কাজে এসেছি" বলিয়াছেন, এই সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা ও মন্তব্য চলিতে লাগিল। মতিলাল বলিল, আশু মুখুজ্জেকে একদিন ভীমনাগের দোকানের সামনে গাড়িতে ব'সে প্রায় সের পাঁচেক সন্দেশ খেতে দেখেছি। বিমল বলিয়া উঠিল, আমাদের পাড়ায় দত্তসাহেব একসঙ্গে একটা আস্ত পাঁঠা খেতে পারে। পার্শ্বে ক্ষেত্র বসিয়া উসখুস করিতেছিল। তাহার এক পরিচিত বন্ধুর খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সে বহু কথা বলিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সে সময়ে কিছুতেই তাহার নাম মনে আনিতে পারিল না এবং ভুলিয়া যাইবার কোন যথাযথ কারণও খুঁজিয়া পাইল না। বন্ধুটি সম্প্রতি দিল্লীতে বদলি হইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু কয়েক মাসের অদর্শন নাম ভুলিয়া যাইবার যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্কুলে ও কলেজে সে বন্ধুটির সঙ্গে বরাবর একসঙ্গেই পড়িয়াছে, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পরেও প্রায়ই তাহার সহিত দেখা হইয়াছে। আড্ডায় আলোচনা পুরাদমেই চলিতে লাগিল। ক্ষেত্র কিন্তু তাহাতে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিতেছিল না। জিজ্ঞাসা করায় বলিয়া উঠিল, দূর ঘোড়ার ডিমের, নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আমরা দেখিলাম, নামটি মনে না পড়ার দরুন সত্যই সে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিছুতেই যখন

মনে পড়িল না, তখন বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ না করিয়া সে আড্ডার আলোচনায় আবার যোগদান করিল। আড্ডা ভাঙিয়া যাইবার পর ক্ষেত্র আমাকে ধরিয়া বসিল, বলিল, আচ্ছা, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! কি ক'রে তার নামটা ভুলে গেলাম বল তো, তার সঙ্গে আমার এত জানাশোনা—! অবাধ ভাবানুষঙ্গ পন্থার আশ্রয় লওয়া গেল। ওই ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট নানারূপ ঘটনা, নাম, মনোভাব প্রভৃতি একে একে ক্ষেত্রের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর অবশেষে একটি বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনার কথা তাহার মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নামটিও মনে পড়িয়া গেল—নামটি রমেশ। অপ্রীতিকর ঘটনাটির বর্ণনা সে এই ভাবে করিয়াছিল, আমি রমেশের আপিসে আমার একটি নিকট আত্মীয়ের চাকুরি করিয়া দিবার জন্য রমেশকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল, চাকুরিটিতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে তাহার যথেষ্ট হাত আছে, কিন্তু সে, তাহার দ্বারা যে এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভবপর নয়, তাহা এমন ভাবে আমায় বুঝাইয়া দিল যে, আমার আর অবিশ্বাসের কোনও কারণ রহিল না। সে দিল্লী চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমার আত্মীয়টির চাকুরি হইল না। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি খবর পাইলাম, রমেশেরই চেষ্টায় সেই চাকুরিতে আর এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে। প্রথমে আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, রমেশের দ্বারাও এইরূপ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে, রমেশ আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবার পর ঘটনাটি যখন বাস্তবিক সত্য বলিয়া জানিলাম, তখন মনে যথেষ্ট আঘাত পাইয়াছিলাম এবং রমেশের বিরুদ্ধে বেশ একটি তীব্র বিদ্বেষভাব আমার মনে জাগিয়াছিল। এমন কি, সে সময়ে আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি এতকালের বন্ধুত্বের এরূপ অবমাননা করিতে

পারে, এতদিনের বন্ধুর সহিত এরূপ কপটাচরণ করিতে পারে, তাহার নাম পর্য্যন্ত মন হইতে মুছিয়া ফেলিব। ঘটনাটি ক্ষেত্রর নিকট নিতান্তই অপ্রীতিকর, সেইজন্য ঘটনাটি এবং তাহার সহিত রমেশ নামটিও স্বতই অবদমিত হইয়া সংজ্ঞান হইতে নির্জ্ঞানে চলিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে নাম ভুলিয়া যাইবার কারণ বোঝা গেল।

আমেরিকার মনঃসমীক্ষক ডক্টর ব্রিল (Dr. Brill) এই সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহার একটি সহকর্ম্মী ডঃ বি— একটি রোগীকে তিন মাস ধরিয়া প্রতিদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শেষ হইয়া যাইবার প্রায় মাস দেড়েক পরে একদিন ব্রিলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার পথে ডঃ বি— সেই রোগীর কথা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগীর নামটি তাঁহার কিছুতেই মনে পড়িল না। নামটি যাহাতে স্মরণে আনিতে পারা যায়, সেজন্য তিনি ব্রিলের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ডঃ বি—এর লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিল অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রণালী অবলম্বন করিলেন। বি— এইরূপ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "রোগী একজন দালাল—অবস্থা এক সময়ে ভাল ছিল—তিন মাস আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন—আমার চিকিৎসায় থাকিয়া একটি কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করেন—চিকিৎসার জন্য আমাকে পারিতোষিক দিবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কিছুই দেন নাই—কয়েকটি কাগজে স্বাক্ষর করাইয়া লইবার জন্য তিনি আমার নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে শেষ আসিয়াছিলেন—আমি কোনও মিথ্যা উক্তি করিব না বলিয়া স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হই—তারপর তাঁহার আর কোন খবর পাই নাই—হ্যাঁ, এখন মনে পড়িতেছে, তাঁহার নামের শেষে 'সন' (son) আছে।" ইহার পর বি— শেষে 'সন' আছে এইরূপ কতকগুলি নাম বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সেগুলি যে রোগীর নাম নয়, তাহা তিনি

নিজে উচ্চারণমাত্রই বুঝিতে পারিতেছিলেন। তাহার পর রোগীর অকৃতজ্ঞতার কথা তাঁহার পুনরায় মনে পড়িল। বি— বলিতে লাগিলেন, "আমি যখন তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে যথেষ্টই কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন এবং আমি তাঁহার জন্য যাহা করিলাম, তাহা তিনি জীবনে ভুলিবেন না, এই কথা বার বার বলিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়াই তিনি আমার সকল প্রাপ্য চুকাইয়া দিবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ডঃ বি— হঠাৎ থামিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর একটি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্রতি নিজের অকৃতজ্ঞতার কথা তাঁহার মনে পড়িল। এই আত্মীয়টিকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না, যদিও ইঁহার নিকট তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। দেড় মাস পূর্ব্বে এই আত্মীয়টি কর্জ্জ হিসাবে কিছু অর্থ চাহিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্রখানি পাঠ করিবার পর তিনি পত্রের বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা তো করেনই নাই, উপরন্তু পত্রখানি কোথায় যে ফেলিয়াছেন, তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। এই আত্মীয়টির নাম ব্রাউন (Brown)। হঠাৎ ডঃ বি— বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে, রোগীটির নাম হচ্ছে ব্রন্‌সন (Bronson)।

ডাক্তার বি—এর ব্রন্‌সন নামটি ভুলিয়া যাওয়ার মূলেও যে একটি অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল, বিশ্লেষণের ফলে তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। ব্রাউনের নিকট বি— নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন। ব্রাউন যখন সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সাহায্য করা বি—এর উচিত ছিল, কিন্তু যে কোন কারণবশতই হউক, তিনি তাহা করেন নাই। উচিত কার্য্য না করিলে মনে সাধারণত যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বি—এর মনেও তাহা হইয়াছিল। এই মানসিক দ্বন্দ্বের অবস্থা অত্যন্তই

পীড়াদায়ক এবং অসহনীয়। এই অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটি উপায় হইতেছে—অবদমন। এই অবদমনের ফলেই ব্রাউন-সম্পর্কীয় সমস্ত ঘটনা, এমন কি 'ব্রাউন' নামটি পর্য্যন্ত বি—এর মনের নির্জ্জান স্তরে চলিয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ বি—সম্পূর্ণ-রূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। (ইংরেজী উচ্চারণে 'ব্রাউন' কথাটির সহিত 'ব্রন' কথাটির সাদৃশ্য থাকায় 'ব্রন' কথাটিও অবদমিত হইয়া গিয়াছিল।) এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া যায় যে, বিশেষ কোন নাম ভুলিয়া যাওয়ার সহিত সাধারণত কোন না কোন অপ্রীতিকর ঘটনার যোগাযোগ থাকে। কিন্তু অন্যের দেওয়া দৃষ্টান্তের দ্বারা সংশয়বাদীদের সংশয় যে দূর হইবে না, তাহা আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি। এই ধরনের ব্যাখ্যা তাঁহাদের নিকট আজগুবি বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু নিজেদের জীবনের এই জাতীয় বিস্মৃতির কারণ যদি তাঁহারা এই ভাবে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা শীঘ্রই যে এই পন্থার কার্য্যকারিতা এবং এই তথ্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিশ্বাস আমি খুব দৃঢ়ভাবেই পোষণ করি। অল্প চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, মনঃসমীক্ষকেরা এ বিষয়ে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন কথা কিছু বলেন নাই। সকল লোকেই ভাসা ভাসা ভাবে যাহা অনুমান করিয়া থাকেন, মনঃসমীক্ষকেরা তাহাই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, জোর করিয়া বলিয়াছেন। আমরা সকলেই আমাদের নামটিকে একটি বিশেষরূপে নিজস্ব জিনিস বলিয়া মনে করি না কি? নামের প্রতি গভীর মমতা পোষণ করি না কি? আমাদের নাম যদি কেহ বিকৃতভাবে বলেন বা লিখেন, সেই ভুলকারীকে আমরা যে খুব প্রীতির চক্ষে দেখি না, এ কথা স্বীকার করিতে আপনারা নিশ্চয়ই দ্বিধা করিবেন না। আমি যদি 'কেবলরাম'কে 'ক্যাবলা' বলিয়া ডাকি বা

সতীশকে প্রতিবার ডাকিবার সময় বলি, "হ্যাঁ, কি বললে হে, ইয়ে, তোমার নামটা যে ভুলে গেলুম," তাহা হইলে কেবলরাম বা সতীশ, উভয়ের কেহই যে আমার উপর সন্তুষ্ট হইবে না, এ কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। আবার নাম ভুলিয়া যাওয়া যে অবজ্ঞা প্রকাশের একটি বিশেষ নিদর্শন, মনঃসমীক্ষকেরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বেই প্রাকৃতজনে তাহা জানিত, এবং সেকালের সাহিত্যিকেরাও তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টি-কার্য্যে রীতিমতভাবে এই কৌশলের সাহায্য লইতেন। বিলাতের একজন বিশেষ খ্যাতনামা অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রভূতক্ষমতাশালী, তেজস্বী, রাষ্টনীতিবিশারদ কিছুকালের জন্য ভারত-সচিব হইয়াছিলেন। একদিন সম্রাট ভারত-সভা (India Council) পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শোনা যায়, সহকর্ম্মীদের প্রতি সচিব মহোদয়ের এমনই প্রীতি ছিল যে, সম্রাটের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিবার সময় কাহারও নাম ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই; 'ক'কে 'খ', 'খ'কে 'গ', যাহা ইচ্ছা বলিয়া গিয়াছিলেন। কোন সাময়িক-পত্রে প্রকাশ না হইয়াও এই ঘটনার কথা যে ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, নামের গোলমালের দরুন সেই সময়ে সভ্যদের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের মনে তীব্র ক্রোধ ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল।

'নাম ভুলিয়া যাওয়া'র দৃষ্টান্ত আর অধিক না বাড়াইয়া এইবার আমরা আর এক প্রকার বিস্মৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

২। **সঙ্কল্প ভুলিয়া যাওয়া**—ডক্টর জোন্‌স (Dr. Jones) তাঁহার পুস্তকে নিজের কর্ম্মজীবনের ঘটনাবলী হইতে সঙ্কল্প বিস্মৃতির বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যে সমস্ত রোগীকে তিনি কোন কারণবশত পছন্দ

করিতেন না, তাঁহাদের দেখিতে যাইবার কথা তিনি প্রায়ই ভুলিয়া যাইতেন। এই অভ্যাসের দরুন তাঁহাকে অনেক সময় নানারূপ অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। এক সময় তিনি কোন একটি হাসপাতালে একজন বড় চিকিৎসকের অধীনে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মনিবের আগামী শুক্রবারে একটি বিশেষ ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। সেই দিন অনুপস্থিতিহেতু রোগী দেখিতে পারিবেন না বলিয়া মনিব সহকারী জোন্‌সকে সেই কার্য্যের ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। জোন্‌সের নিকট এই প্রকার অনুরোধের একটি বিশেষ মূল্য ছিল, কারণ সচরাচর কোন চিকিৎসকই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিনা আদেশে তাঁহার নিজের রোগী দেখিবার জন্য অন্য চিকিৎসককে অনুরোধ করিতে পারেন না। জোন্‌স তৎক্ষণাৎ সানন্দে মনিবের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার একবারও মনে হইল না যে, সেই শুক্রবারের ঠিক সেই সময়েই তাঁহার নিজের একটি বিশেষ রোগী দেখিতে যাইবার কথা আছে। এই রোগীটি দেখিতে যাইবার তাঁহার যে শুধু যথেষ্ট আগ্রহ ছিল তাহা নহে, তাহার সহিত পূর্ব্ব হইতে যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহা নড়চড় করাও তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। সপ্তাহের মধ্যে বহুবার জোন্‌স এই দুইটি ভবিষ্যৎ কার্য্যের কথা ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একবারও একই সময়ে এই দুইটি কার্য্যের কথা তাঁহার মনে হয় নাই। শুক্রবার যখন আসিল, জোন্‌স মনিবের অনুরোধের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার নিজের যে রোগীকে দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, তাহাকে দেখিয়া আসিলেন। ইহাতে তাঁহাকে যে মনিবের বিশেষ বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মনিবের আদেশে হাসপাতালে রোগী দেখিতে যাওয়া অপেক্ষা তাঁহার

নিজের রোগী দেখিতে যাওয়া তাঁহার নিকট অধিকতর প্রীতিকর ছিল, সেইজন্যই তাঁহার এইরূপ বিস্মৃতি সম্ভব হইয়াছিল।

অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমরা যে অনেক সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক নানা রকম কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকি, আশা করি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যেমন ধরুন, কাহাকেও কোন সময়ে বাড়িতে আসিয়া দেখা করিতে বলিলাম, কিন্তু বিশেষ কাজের অছিলায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে থাকিলাম না—রাগ করিবেন না, আপনাদের জীবনে এইরূপ ঘটনা কি কোনদিন ঘটে নাই? যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করি, তখন সেই কার্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা বেশ সচেতন থাকি। লোকটির সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা যে আমাদের আদৌ নাই (হয়তো লোকটি পাওনাদার, কিংবা চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছে), তাহা আমরা স্বতই স্বীকার করিয়া লই, অর্থাৎ তাহার সহিত দেখা করিবার অনিচ্ছা আমাদের সংজ্ঞানেই থাকে। কিন্তু যখন এই ধরনের অনিচ্ছা সংজ্ঞানে না থাকিয়া নির্জ্ঞানে থাকে, অর্থাৎ লোকটির সহিত দেখা করিবার যে আমার ইচ্ছা নাই, ইহা মানিয়া লইতে স্বীকৃত না হই, তখনই এই জাতীয় ঘটনাকে বিস্মৃতির পর্য্যায়ে ফেলা হয়। সঙ্কল্প বিস্মৃতির মূলে, অধিকাংশ সময়েই যে সঙ্কল্পিত কার্য্য করিবার পক্ষে কোন অন্তর্নিহিত বাধা থাকে, বিশ্লেষণ করিলে তাহা সহজেই বুঝা যায়। মনঃসমীক্ষকেরা সেই অন্তর্নিহিত বাধার স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনে করুন, কোন পরিচিত ব্যক্তি কার্য্যোপলক্ষ্যে ধর্ম্মতলার দিকে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে চাঁদনির পি. সি. দত্তের দোকান হইতে পাইপের জন্য এক টিন তামাক আনিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সানন্দে রাজি হইলেন। কয়েক ঘণ্টা পর তিনি কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন,

কিন্তু তামাক আসিল না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওই যাঃ, এক্কেবারে ভুলে গেছি।" তারপর ভুলিয়া যাইবার নানারূপ কারণ দেখাইতে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার ত্রুটির জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এত কারণ দেখানো সত্ত্বেও সেই পরিচিত ব্যক্তির প্রতি আপনার মনোভাব তখন কিরূপ হওয়া স্বাভাবিক? আপনি অবশ্য অতীব বিনয় ও ভদ্রতা সহকারে বলিবেন, "না না, তার জন্যে কি, এতে লজ্জা পাবার কি আছে?" মুখে বলিলেন বটে, কিন্তু ওই কথাতেই কি আপনার তখনকার মনের ভাব ঠিকভাবে ব্যক্ত হইল? ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছা-পূর্ব্বকই হউক, আপনার অনুরোধ বিস্মৃত হওয়ার মূলে আপনার প্রতি একটি অবহেলার ভাব যে তাঁহার মনে লুক্কায়িত আছে, তাহা অনুমান করিয়া কি আপনি ক্ষণিকের জন্যও ক্ষুণ্ণ হন না? মনঃসমীক্ষকেরা বলেন, আপনার অনুমানই যথার্থ। আপনিও যখন ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ রক্ষা করিতে ভুলিয়া যান, তখন তাঁহার প্রতি আপনার মনোভাবের সন্ধান লউন। স্বামী যখন স্ত্রীর ছোটখাটো অনুরোধ (যেমন, আজ আপিস থেকে আসবার সময় অমুককে একবার আসতে ব'লে এসো তো, বা খোকার জন্যে ট্রামের ধারে ওই যে দুআনা দিয়ে বায়োস্কোপ বিক্রি করে, এনো তো, ইত্যাদি) বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করেন, তখন স্ত্রী মনঃসমীক্ষণের সাহায্য না লইয়াও অন্তরে অন্তরে ঠিকই অনুমান করেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসার সম্বন্ধের মধ্যে পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে।

চিঠিসংক্রান্ত নানা রকম ভুল এই শ্রেণীর বিস্মৃতির মধ্যে ধরা যাইতে পারে। যেমন—চিঠি পকেটে রাখিয়া সময়মত ডাকে দিতে ভুলিয়া যাওয়া, খামের উপরে ভুল ঠিকানা লেখা, একজনের উদ্দেশ্যে লিখিত

চিঠি অন্যের নাম-লেখা খামের ভিতরে ভরিয়া দেওয়া, প্রভৃতি। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই ধরনের ভুলের মূলে অনেক সময় চিঠি পাঠাইবার পক্ষে পত্রপ্রেরকের মনে একটি গুপ্ত বাধা বিদ্যমান থাকে। সেদিন সকালে খবরের কাগজে ডেড লেটার অফিস হইতে প্রকাশিত একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল। কত সহস্র এবং কত রকমের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় চিঠি, ভুল ঠিকানা লেখার দরুন বা ঠিকানা না লেখার দরুন সেই বৎসরে ডেড লেটার অফিসে জমা হইয়াছে, তাহার একটি বিবৃতি ছিল। সন্ধ্যাবেলায় আড্ডায় এই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। আমাদের রাজেন স্পোর্টস্‌ম্যান, ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, অবসর পাইলে কিছু সাহিত্য-চর্চ্চাও করিয়া থাকে বটে, কিন্তু মনোবিদ্যার ধার দিয়াও সে যায় না। এই প্রসঙ্গে সে নিজে দিনকতক আগে কি রকম একটা ভুল করিয়াছিল, তাই বলিল। "তখন ক্রিকেট সিজ্‌ন, খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া আমি ভয়ানক ব্যস্ত। অন্দর থেকে রোজই তাগাদা হয়, অমুককে চিঠি লেখা হয়েছে কি না? কয়েকদিনের তাগাদার পর সত্যই আমি জোর ক'রে ব'সে চিঠিখানি লিখে ফেললাম। দিন তিনেক বাদে পকেটে হাত দিয়ে হঠাৎ দেখলাম যে, ওই চিঠিখানি আমার পকেটেই প'ড়ে রয়েছে। নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডেকে, চিঠিখানা ফেলে দিয়ে আসতে বললাম। দিন-কয়েক বাদে চিঠিখানা পোস্ট-আপিস থেকে ফিরে এল। পোস্ট-আপিসের অবশ্য কোন দোষ ছিল না, কারণ খামের উপর ভুল করে আমি নিজের ঠিকানাই লিখে ফেলে ছিলাম। তখন কি করি, অন্য একখানা খামের ওপর নাম ঠিকানা লিখে, চিঠিখানা তার মধ্যে পুরে, তাড়াতাড়ি নিজেই ডাকে দিয়ে এলাম। কিছুদিন পরে অনেকগুলি পোস্ট-আপিসের

ছাপ-খাওয়া অবস্থায় চিঠিখানা আবার ফেরত পেলাম। মনে হ'ল, এ কি ব্যাপার, চিঠিখানা ফিরে এল কেন আবার? শেষে দেখি, ঠিকানা লিখতে ভুল করেছি। মনে মনে হাসিও পেল, রাগও হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট-আপিসের লোকদের অসীম ধৈর্য্যের ওপর ক্ষণিকের জন্য শ্রদ্ধাও একটু বেড়ে গেল। এবার কিন্তু খুব মনোযোগ সহকারে ঠিকানা লিখে, ডাকে ফেলে দিয়ে এলাম। দিন সাতেক পরে চিঠির উত্তর পেলাম। অন্যান্য খবর লেখবার পর তিনি জানতে চেয়েছেন, চিঠিখানা বেয়ারিং হবার কারণ কি?" ক্ষেত্র সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এবার স্ট্যাম্প লাগাতে ভুল করেছিলে বুঝি?" রাজেন বলিল, "হ্যাঁ ভাই, ঠিকই ধরেছ, এবার সব ঠিক ক'রে টিকিট লাগাতেই ভুল করেছিলুম। একখানা চিঠি পাঠাতে এত গোলমালও হয়!" বিমল বলিল,"সব সময়ে চিঠি পাঠাতে তো এত ভুল হয় না, লোকটি কে, কাকে চিঠি লিখেছিলে?" রাজেন যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "আরে, সে একজন আমাদেরই আত্মীয়।" একটু থামিয়া সে আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল, "লোকটা যেন কেমন এক ধরনের।" কথাবার্ত্তা হইতে স্পষ্ট জানা গেল, রাজেন লোকটিকে বিশেষ পছন্দ করে না। এই অপছন্দের দরুনই যে আত্মীয়কে চিঠি লিখিবার পক্ষে রাজেনের এত বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল, আশা করি, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। আরও দুই-একটি প্রশ্ন করাতে রাজেন স্বীকার করিল, চিঠিখানি তাহার আত্মীয়ের নিকট পৌঁছায়, ইহা রাজেনের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না।

বিস্মৃতি সম্বন্ধে আরও প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। চেষ্টা করিলে নিজেদের জীবন হইতেই নানাজাতীয় বিস্মৃতির বহুবিধ ঘটনার কথা আপনারা সহজেই মনে করিতে পারিবেন। এইগুলি যথাযথ

বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে, ইহাদের মূলেও উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির ন্যায় কোন একটি অপ্রীতিকর ঘটনার সন্ধান পাইবেন। সুতরাং বিস্মৃতির কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি এই কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমত, কোন ভুলই দৈবাৎ ঘটে না। দেখা যায়, যদি কোন একটি নাম স্মরণ করিতে বা একটি কার্য্যের কথা মনে করিতে একবার ভুল হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কালেও সেই নাম বা সেই কার্য্যের সম্বন্ধে প্রায়শই ভুল ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই ভুলের পশ্চাতে যে একটি বিশেষ কারণ আছে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই অযৌক্তিক নহে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ বিস্মৃতি-ব্যাপারের সহিতই কোন একটি অপ্রীতিকর মানসিক অবস্থার যোগাযোগ থাকে। সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা সব সময়ে ভ্রান্তের সংজ্ঞানে থাকে না। তৃতীয়ত, মনে করিয়া রাখিবার অনিচ্ছাই আমাদের অনেক বিস্মৃতির কারণ। জীবনের অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে (সব ক্ষেত্রেই, এ কথা এখন বলিলাম না) ভুলিয়া যাওয়া, 'স্মরণে না রাখার ইচ্ছার'ই নামান্তর। এ কথার সত্যতা শুধু মনঃসমীক্ষক কেন, সাধারণ লোকেও অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন।

বিস্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে 'ভুল' (mistakes, errors) সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(খ) ভুল

যে সমস্ত ভুল কাজ প্রধানত ভুলিয়া যাওয়ার উপর নির্ভর করে না, আমাদের প্রবন্ধে শুধু সেইগুলিকেই আমরা ভুল (mistakes, errors) বলিব। যদিও বিস্মরণ এই ধরনের ভুলের জন্য মূলত দায়ী

নহে, তাহা হইলেও ইহার সহিত বিস্মরণের যে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। কারণ-বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের মূলেই একই মানসিক ক্রিয়া, যাহাকে আমরা অবদমন বলিয়াছি, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বিস্মৃতির ন্যায় 'ভুল'ও নানা প্রকারের হইতে পারে। আমরা কয়েক জাতীয় ভুলের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। **কথার ভুল**—'এক কথা বলিতে আর এক কথা বলা'—এই ভুলটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত বেশিরকম ঘটিয়া থাকে যে, সাধারণত আমরা সেগুলিকে লক্ষ্যই করি না, এবং লক্ষ্য করিলেও ওই ভুলের মধ্যে যে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা আছে বা উহার কোনও অর্থ আছে, ইহা আমাদের আদৌ মনে হয় না। কিন্তু কোন্ অবস্থায় এবং কিরূপ ক্ষেত্রে এই ভুল সংঘটিত হয়, মনোযোগ সহকারে বুঝিবার চেষ্টা করিলেই অর্থাৎ ভুলগুলি বিশ্লেষণ করিলেই সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ভুলেরও বাস্তবিক অর্থ আছে। এই বিশ্লেষণ-কার্য্য যে সর্ব্বদাই একটি দুরূহ ব্যাপার, তাহা নহে। সাধারণত অল্প চেষ্টা করিলেই আপনাদের নিজেদের বা বন্ধুবান্ধবদিগের কথার ভুলের নিহিত অর্থ আপনারা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন।

অষ্ট্রিয়ার পার্লামেণ্টের সভাপতি মহাশয় একবার কিরূপ ভুল করিয়াছিলেন, ফ্রয়েড তাঁহার পুস্তকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভার কার্য্য উদ্বোধন করিবার সময় সভাপতি বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যা উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব এইবার সভার কার্য্য বন্ধ করা যাউক।" সেই অধিবেশনে কয়েকটি বিরোধিতামূলক প্রস্তাবের আলোচনা হইবার কথা ছিল। সভ্যদের মধ্যে যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইবে, সভাপতি মহাশয় তাহার আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং তাহার সম্মুখীন হইতে তাঁহার মন চাহিতেছিল না। এই

অনিচ্ছাই তাঁহার 'আরম্ভে'র পরিবর্ত্তে 'বন্ধ' বলার জন্য দায়ী। আমি সেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ি হইতে আর একজনের সহিত টেলিফোন-যোগে কোন সাংসারিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি ওই বিষয়ে আরও আলোচনার সুবিধার জন্য আমার বাড়ির টেলিফোনের নম্বর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমার নম্বর জানাইয়া আমি তাঁহাকে সোমবার সন্ধ্যাবেলায় কথাবার্ত্তা কহিতে বলিয়াছিলাম। সোমবার দিন কিন্তু ওই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এবং তিনিও আমায় টেলিফোনে ডাকেন নাই। তাহার পরদিন তিনি সকালবেলা আসিয়া হাজির হইলেন, বলিলেন, "কি হে, তোমায় টেলিফোনে কতবার ডাকলাম, প্রত্যেক বারই বললে যে, তোমার নামে কোনও ভদ্রলোক এ বাড়িতে থাকেন না।" আমি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম, ফোনে কত নম্বর চেয়েছিলেন?" তিনি বলিলেন, "তুমি যা বলেছিলে, আমি তখনই তা লিখে নিয়েছিলাম,—রিজেণ্ট ১৯৬ তো? এই দেখ, লেখা রয়েছে।" আমি তখন বলিলাম, "তাই নাকি? রিজেণ্ট ১৯৬ তো আমার নম্বর নয়, আমার এক বন্ধুর নম্বর, আমার নম্বর হচ্ছে রিজেণ্ট ৬৭৫, আমি তা হ'লে ভুল করেছিলাম।" ভদ্রলোক চলিয়া যাইবার পর আমি এক নম্বর বলিতে আর এক নম্বর কেন বলিয়াছিলাম, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইল না, অল্প চেষ্টাতেই নিজের মনের সহিত যে চাতুরি করিতেছিলাম, তাহা ধরা পড়িয়া গেল। ভদ্রলোকটি যে প্রস্তাব করিতেছিলেন, তাহাতে আমার আদৌ মত ছিল না, অথচ ঘটনাচক্রের এমন সমাবেশ হইয়াছিল যে, সে বিষয়ে সামনাসামনি অমত করিবার উপায় ছিল না। এই অনিচ্ছাই যে ভদ্রলোককে ভুল নম্বর বলিবার ও সোমবার দিন ওই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইবার কারণ, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে

পারিতেছেন। আরও একটু কথা আছে। আমার নম্বর না বলিয়া বন্ধুর ফোন-নম্বর কেন বলিলাম, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাইলাম। আমি জানিতাম, যে বন্ধুটির টেলিফোন-নম্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, সেই বন্ধুটি যদি ঘুণাক্ষরেও এই প্রস্তাবের কথা জানিতে পারিত, তাহা হইলে সেই প্রস্তাবটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। কোনক্রমে বন্ধুটির কানে এই প্রস্তাবটি উঠুক, এইরূপ বাসনা আমার নির্জ্ঞানে ছিল। কারণ অপ্রীতিকর অবস্থাটি হইতে বাঁচিতে হইলে আমার উপস্থিত ওই একটিমাত্র উপায় ছিল।

২। **পড়ার ভুল**—এক কথা বলিতে আর এক কথা বলা যেমন ভুল, এক পড়িতে আর এক পড়াও একই জাতীয় ভুল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসিয়া আছি। পাশের বাড়ির মাস্টার মহাশয়ের কণ্ঠস্বর, আর ছোট ছেলেটি কখনও দ্রুত, কখনও বা শ্লথ গতিতে পড়িতেছে, শুনিতে পাইতেছিলাম। ছেলেটি সুর করিয়া পড়িতেছে, "য়েঁ, কদাচ-অ কুবাক্য-অ বলিও-ও না-আ-আ। য়েঁ, খেলিবার সময় খেলিবে, পড়িবার সময় খেলিবে……," সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম, মাস্টার মহাশয়ের চীৎকার ও চপেটাঘাতের শব্দ আর ছেলেটির ক্রন্দনধ্বনি। ছেলেটির পড়িবার অনিচ্ছাই যে এইরূপ ভুলের কারণ, তাহা বোধ হয়, না বলিলেও চলে। গৌরহরি এক রবিবারে আসিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "ওহে, কাল একটা মস্তবড় আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলাম, কিন্তু ভাই, দুর্ভাগ্য এমন, ধোপে টিকল না, ফসকে গেল।" তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া ক্ষেত্র ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ব্যাপার কি?" সে বলিল, "আর বল কেন, মহারাজ সেদিন রামকৃষ্ণের একখানা বই হাতে দিয়ে বললেন, 'গৌরহরি, তোমার মনটা বড় চঞ্চল দেখছি, সুবিধামত এই বইটা প'ড়ো।' বিশেষ

পেড়াপীড়িতে রাজি হয়ে বইটা নিলাম। একদিন পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় পড়লাম, লেখা রয়েছে—'মানবের নিয়মানুযায়ী ঈশ্বরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।' আমি প্রথমে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কারণ রামকৃষ্ণের মত একজন লোক, যাঁকে নিয়ে তোমরা সকলে এত মাতামাতি কর, যুগাবতার ব'লে পুজো কর, তিনিও যে আমার মত ভগবানের চেয়ে মানুষকে বড় করেছেন, তাই জেনে ভারি আনন্দ হ'ল। তখনই মনে করলাম যে, এবার আড্ডায় এসে তোমাদের খুব একচোট শুনিয়ে যাব। বইটা ভাল ক'রে পড়বার দিকে তখন একটু চেষ্টা হ'ল। হায় রে, এই চেষ্টাই হ'ল কাল, মনঃসংযোগ ক'রে পড়তে গিয়ে দেখি, একটা মস্ত ভুল করেছি। ঈশ্বরের জায়গায় 'মানব' আর মানবের জায়গায় 'ঈশ্বর' পড়েছি। তখনই আবার অন্য কথা মনে হ'ল। সেদিন আড্ডায় ওই যে ওই মনোবিদ্ বলছিল, ভুলের সঙ্গে কি ইচ্ছা না অনিচ্ছার যোগাযোগ আছে, কথাটা বোধ হয় ঠিক।"

৩। **লেখার ভুল**—লেখার ভুলও আমাদের প্রায়শই হইয়া থাকে। ছাপার ভুল অবশ্য আমরা ছাপাখানার ভূতের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু আমাদের সাধারণ চিঠিপত্র প্রভৃতি লেখার মধ্যে যে কত ভুল হইয়া যায়, তাহার খবর আমরা বিশেষ রাখি না। লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, চিঠিপত্রে—বিশেষ করিয়া নূতন বৎসরের প্রথম দিকে যে সকল চিঠিপত্র লেখা হয়, তাহাতে—অনেক সময় বিগত সনটিই উল্লিখিত হয়। এই ভুলের জন্য কি কেবলমাত্র অভ্যাসই দায়ী? অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে 'একটি বৎসর কাটিয়া গেল' ইহা মানিয়া লইবার অনিচ্ছাই এই ভুলের মূলে থাকে। 'একটি বৎসর কাটিয়া গেল' ইহার অর্থ, বার্দ্ধক্যের দিকে আরও কিছু অগ্রসর হইলাম। বার্দ্ধক্যের এই গতি কল্পনা করিতে মনে একটু দ্বিধার সঞ্চার

হয় না কি? কিন্তু আপনারা হয়তো বলিবেন, সকলেই তো আর (লেখকের মত) প্রৌঢ় নন, বসিয়া বসিয়া শেষ জীবনের কথা ভাবিতেছেন না। যখন একজন অল্পবয়স্ক বালক বা কোন স্বাস্থ্যবান যুবক তারিখের এইরূপ ভুল করে, তাহাদের বেলাতে নিশ্চয় এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন হইবে না। ঠিক এই ব্যাখ্যাটি যে তাহাদের পক্ষে সমীচীন নয়, ইহা অবশ্য আমি স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু বালক বা যুবকদের এই ভুল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই বৎসর কাটিয়া গিয়া নূতন বৎসর আসুক, কোন কারণবশত ইহা তাহাদের আদৌ অভিপ্রেত নহে। যে সকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই, তাহারা অনেক সময় ভুল করিয়া তারিখ পিছাইয়া দেয়। এই মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহারা পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার চেষ্টা করে।

জোন্‌সকে নববিবাহিতা একটি ভদ্রমহিলা একদিন বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি তাঁহার এক পুরানো পুরুষ-বন্ধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছেন, যাহার শেষ লাইনে এইরূপ অদ্ভুত কথা লেখা ছিল—"আশা করি, তুমি শারীরিক কুশল এবং মানসিক অশান্তিতে আছ।" সেই বন্ধুটি এক সময় ভদ্রমহিলাটিকে বিবাহ করিবার আশা করিতেন। ভদ্রমহিলাটি যে আর একজনকে বিবাহ করিয়া শান্তিতে থাকিবেন, এই চিন্তা বন্ধুটির পক্ষে বিরক্তিকর, এবং এই বিরক্তি 'শান্তি'র পরিবর্ত্তে 'অশান্তি' কথাটি লিখিবার জন্য দায়ী।

১। **ছাপার ভুল**—মুদ্রাযন্ত্র বা টাইপরাইটিং কল হইতে ছাপা লেখায় যে ভুল থাকে, তাহা যে সব সময়ে নিরর্থক—এ কথা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া চলে না। ছাপাখানার ভূত যে অনেক সময় মুদ্রণকার্য্যে ব্যাপৃত লোকদের মনের নির্জ্ঞান স্তরেই বাস করে, ইহার কিছু কিছু

আভাস অনেক সময় পাওয়া গেলেও তাহা প্রমাণ করা সব সময় কার্য্যত সম্ভব নহে। 'ললনা'র পরিবর্ত্তে 'ছলনা', 'শান্তি'র জায়গায় 'শাস্তি', 'Freud'-এর স্থলে 'Fraud' প্রভৃতি ভুল ছাপাগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইলে, কোন নিহিত বাসনার সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। মনে পড়ে, ছাত্রাবস্থায় আমার দাদামহাশয়ের নিকট হইতে গল্প শুনিয়াছিলাম, তাঁহার অফিসের এক কেরানীবাবু, 'dearth of officers'-এর পরিবর্ত্তে 'death of officers' টাইপ করিয়া সাহেবের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। গল্পটি শুনিয়া তখন অবশ্য খুব আমোদ অনুভব করিয়াছিলাম ও হাসিয়াছিলাম, এখন কিন্তু এই ভুলের মধ্য দিয়া বেচারী কেরানীবাবুর যে অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার জন্য মনে কিঞ্চিৎ সমবেদনা জাগে।

৫। **দেখার ভুল**—আমাদের বন্ধু প্রতীক্ষাকুমারের চাকুরির একটি ইতিহাস আছে। বর্ত্তমান চাকুরি পাইবার আগে সে অনেক জায়গায় দরখাস্ত করিয়াছিল। একবার সে একখানি চিঠি পাইয়াছিল। খুলিয়া দেখিল, গিলাণ্ডার্স আপিস হইতে আসিয়াছে, তাহার চাকুরি হইয়াছে। কত বেতন, কোন্ তারিখে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে, তাহাতে সব লেখা ছিল। নির্দ্ধারিত দিনে সে আপিসে গিয়া বড় সাহেবের কামরায় সেলাম ঠুকিল। সাহেব তাহাকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, চাকুরির চিঠি পাইয়া সে আসিয়াছে, আজ তাহার কার্য্যে আরম্ভ করিবার দিন। সাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "চাকরি তো আর খালি নেই, একটি খালি হয়েছিল, তা দিন পাঁচ-ছয় হ'ল ভর্ত্তি হয়ে গেছে।" সাহেবের চিঠিখানা হাতে দিয়া প্রতীক্ষা বলিল, "আপনি তো সার্, আজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, চিঠিতে লেখা ছিল ১৭ই মার্চ ১০॥টার সময় আসতে, আমি তাই

এসেছি।” সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিঠিখানি খুলিলেন, তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “না বাবু, আপনার ভুল হয়েছে, আপনাকে আসতে বলেছিলাম ১১ই মার্চ ১০॥টার সময়, এই তো স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে।” প্রতীক্ষা দেখিল, সত্যই তাহার ভুল, চাকুরি তাহার হইল না। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, কেমন করিয়া তাহার এ ভুল হইল। পরে সবই জানা গেল। চাকুরিটির বেতন ছিল মাসিক তিরিশ টাকা, সে গ্র্যাজুয়েট, এ চাকুরিটি গ্রহণ করিতে মনে মনে তাহার প্রবল অনিচ্ছাই ছিল। এই অনিচ্ছাই তাহার ভুলের কারণ। দেখার ভুল যে কেবল ছাপার অক্ষর সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, অন্য বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধেও হইতে পারে।

আমার দাদা সেদিন ছুটির সময় কর্ম্মস্থল হইতে শেয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া নামিবামাত্র একজন ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে, কেমন আছ, কোথা থেকে আসা হ’ল?” কিন্তু তিনি দাদার মুখের ভাব দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, দাদা তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না, তখন বলিলেন, “তা এখন চিনতে পারবে কেন, এখন তুমি বড়লোক হয়েছ। ইত্যাদি ইত্যাদি।” দাদা বলিলেন, “হ্যাঁ, বাস্তবিকই আমি আপনাকে চিনতে পারছি না, আপনি আমায় কোথায় দেখেছিলেন বলুন তো?” ভদ্রলোকটি বিস্তারিত বিবরণ দিলে দাদা বলিলেন, “আপনার ভুল হয়েছে, আপনি যাঁকে মনে করেছেন, আমি সে লোক নই।” ভদ্রলোক তখন হাতজোড় করিয়া বলিলেন, “মাপ করবেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, ওই লোকটিকে অনেকদিন দেখি নি কিনা!” অপরিচিতকে পরিচিত ভাবিয়া সম্ভাষণ করা বা পরিচিতকে অপরিচিত মনে করিয়া বিনা সম্ভাষণে চলিয়া যাওয়া, সব সময় দৃষ্টিশক্তির গোলমালের উপর নির্ভর করে না। পরিচিত লোককে চিনিতে না

পারার মূলে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে না চিনিবার ইচ্ছাই বর্ত্তমান থাকে, ইহা অনুভব করিতে পারা, জোন্‌স সত্যই বলিয়াছেন, নারীজাতির একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা।

৬। **শোনার ভুল**—যখন উৎকণ্ঠিতভাবে বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করি, তখন শব্দমাত্রকেই বন্ধুর জুতার আওয়াজ বলিয়া মনে হয়। এ অভিজ্ঞতা খুবই সাধারণ। বর্দ্ধমান জেলার যে লোকটি আমার বাড়িতে চাকুরি করে, তামাক খাইবার প্রবণতা তাহার কিছু অধিক মাত্রায় আছে। আড্ডার জন্য যত হিসাব করিয়া তামাক আনাই না কেন, দুই দিন অন্তর মাথা চুলকাইয়া সে বলিবেই, "বাবু, তামাক ফুরিয়ে গেছে।" মনে মনে ব্যাপারটি বুঝি, বকুনিও দিই, কিন্তু অনেক দিনের পুরানো চাকর, বিশেষ কিছু আর বলি না। সেদিন বাড়িতে জনকতক অতিথি সমাগমের কথা ছিল। চাকরটিকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলাম, "আজ সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন ভদ্রলোক আসবেন, তাঁদের ভাল ক'রে অভ্যর্থনা করতে হবে, বাইরে কোথাও যাস নি, এখানেই থাকবি, বুঝলি? আর হ্যাঁ, শোন্, কিছু ফুল এনে রাখিস তো।" অতিথিগণ চলিয়া যাইবার পর তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ রে, ফুল কি হ'ল? আনিস নি বুঝি?" সে সপ্রতিভভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এনেছিলাম তো, ওই গুল দিয়েই তো তামাক সাজলাম।" আমি বলিলাম, "তোকে গুল আনতে বলেছিল কে?" 'ফুল' শুনিতে 'গুল' সে কেন শুনিয়াছিল, আশা করি, আপনারাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, তাহার এই ভুল শোনার দরুন অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই বলিয়া চাকরটিকে কিছু আর বলিলাম না, বরং মনে মনে একটু আমোদই উপভোগ করিলাম।

৭। **কাজের ভুল**—যেমন কথা-সংক্রান্ত নানা রকম ভুল

আমাদের হয়, সেই রকম কাজ করিতে গিয়াও নানারূপ ভুল আমরা করিয়া থাকি। এক কাজ করিতে গিয়া আর এক কাজ করিয়া বসা, জিনিস এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় রাখা, মুদ্রাদোষ, নানাবিধ আপাত-অর্থহীন অভ্যাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর ভুল। পূর্ব্ব-আলোচিত ভুলগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময় যে উপায় এবং সূত্রের সাহায্য লইয়াছিলাম, এই সকল ভুলও যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনুরূপ উপায় এবং সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এই সকল ভুলের সহিতও অবদমিত ইচ্ছার যোগাযোগ আছে। সুরেন সেদিন বলিল, "আজ কি ভুলই একটা করেছি। আপিস থেকে ঠিক চারটের সময় পার্কসার্কাসে গিয়ে অমুকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। আমি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে শ্যামবাজারের ট্রাম থেকে নেমে, পার্কসার্কাসের ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ট্রাম আর আসে না, কি করি, খবরের কাগজের একখানা স্পেশাল ইস্যু কিনলাম। এমন সময় ট্রাম এসে গেল। আমিও তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলাম। কিছুক্ষণ বাদে বাস-কণ্ডাক্টারের চীৎকার কানে আসিল, 'শেয়ালদা-যানেওয়ালা উতার যাইয়ে।' চমকে উঠে কাগজ থেকে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে দেখি, শেয়ালদায় এসে পড়েছি। ঘড়িতে দেখি, চারটে বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি আছে। ট্রাম থেকে তো নেমে পড়লাম। হিসেব ক'রে দেখলাম, চারটের মধ্যে কোনক্রমেই পার্কসার্কাস পৌঁছতে পারা যায় না।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করলে?" সে বলিল, "কি আর করব, সটান বাড়ি চ'লে গেলাম, কালকে যা হয় একটা এক্সপ্ল্যানেশন দেওয়া যাবে।" কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল যে, পার্কসার্কাসে সেই লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুরেনের মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

কোন ঠাকুরবাড়ির বা মন্দিরের নিকট দিয়া যখন ট্রাম যায়, তখন লক্ষ্য করিলে আরোহীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আচরণ দেখিতে পাইবেন। দেখিবেন, কেহ বা হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, কাহারও মুখ তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল, কেহ নাক ঘাড় বা মাথাটি চুলকাইয়া লইলেন, কেহ বা অল্প উসখুস করিয়া নড়িয়া বসিলেন, এবং কাহারও বা কোন ভাবান্তরই হইল না। ঠিক মন্দিরের নিকটে আসিয়াই নিয়মিতভাবে নাক কিংবা ঘাড় বা মাথাটি চুলকাইয়া উঠে কেন, বা নড়িয়া চড়িয়া উসখুস করিয়া বসিবার প্রয়োজন হয় কেন, বলিতে পারেন? আমি যদি বলি, ঠাকুর নমস্কারের আন্তরিক ইচ্ছা এবং আশপাশের লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে না করে এই ইচ্ছা, এই দুইটি মনোভাব প্রকাশের দ্বন্দ্বের ফলেই এইরূপ আচরণের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটি কি নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে?

মুদ্রাদোষ কাহাকে বলে, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। কৌতুকপ্রদ সামান্য অঙ্গভঙ্গী (যেমন নাসিকাকুঞ্চন, চোখ-পিটপিট করা ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া জটিলতাপূর্ণ কষ্টকর কার্য্য-সমষ্টি পর্য্যন্ত, মুদ্রাদোষ নানা প্রকারের হইতে পারে। অনেক মুদ্রাদোষের মূলেই পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সেই ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানের গভীর স্তরে থাকে বলিয়া সহজে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি আমাদের আপাত-অনিচ্ছানুসারে করিয়া থাকি, তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপরে দিয়াছি এবং তাহাদের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। মনঃসমীক্ষকদের মতে এই ভুলগুলি নিরর্থক নহে। যে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছি বা যে কথা বলিতে যাইতেছি, সেই কথা বলিবার বা সেই কার্য্য করিবার

গোপন অনিচ্ছার বা ঐ সংক্রান্ত কোন অবরুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ এই ধরনের ভুলের ভিতর দিয়া হইয়া থাকে। ভুলগুলি যে অর্থহীন নহে, এ কথা মানিতে আপনারা হয়তো বিশেষ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যে ভাবে ভুলগুলি ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইতে, আমার মনে হয়, আপনারা অনেকেই কুণ্ঠিত হইবেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথম—সাধারণত যত প্রকারে ভুলগুলির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যায়, আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তাহাদের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছি। দ্বিতীয়—কোন একটি তথ্যের সত্যতা কি করিয়া প্রমাণ করা যায়? যদি বহু স্থানে বহু গবেষক অনুসন্ধানের ফলে একই তথ্যে উপনীত হন, তাহা হইলে সেই তথ্যটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ সত্য, ইহা প্রমাণ হয় না কি? এ দিক দিয়া বিচার করিলে মনঃসমীক্ষকদের ব্যাখ্যা-প্রণালী যে উপযুক্ত, ও তথ্য যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ হয় না। কারণ বহু অনুসন্ধিৎসু—সকলেই যে মনঃসমীক্ষক, তাহা নহে—এই তথ্যের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। আপনারা নিজেরাও যদি এখন হইতে নিজেদের অথবা বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়িবে, সেগুলির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবেন। তৃতীয়ত—যদি ভুলভ্রান্তি ব্যতীত মানসিক অন্যান্য ব্যাপার আলোচনা করিতে গিয়াও আমরা এই সমস্ত তথ্যেরই সন্ধান পাই, তাহা হইলে তথ্যের মূল্য স্বতই বৃদ্ধি পাইবে না কি? স্বপ্নাবলী, নানাবিধ মনের রোগ, শিল্পকলার সৃষ্টি প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে অধ্যয়ন করিলে আমরা পুনরায় এই সূত্রসমূহেরই সন্ধান পাই। সুতরাং এই সূত্রগুলি মানিয়া লইবার পক্ষে যুক্তি প্রবলতর হয়। চতুর্থত—যদি অন্য সমস্ত তথ্য অপেক্ষা কোন একটি বিশেষ

তথ্য কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ দ্বারা মনের নানাবিধ ঘটনার বিষয় বুঝিবার পক্ষে অধিকতর সাহায্য করে, তবে সে বিশেষ তথ্যটি না মানিবার তো কোন কারণই থাকে না। সর্ব্বশেষে এ কথা বলা যায়, ফ্রয়েড প্রণোদিত এই ধরনের ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে সকলেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, এবং আপনারাও করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিতদিগের তালিকা হইতে ভুলক্রমে আপনার নাম বাদ পড়িয়াছে শুনিলে আপনি ক্ষুণ্ণ হইয়াই থাকেন এবং বাদ পড়ার মূলে একটু অবহেলার (তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিলাম না) অস্তিত্বের অনুমান স্বতই করিয়া লন। আরও একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখি। আপনি নিজে যখন অন্যের তালিকা হইতে বাদ পড়েন, তখন এই ব্যাখ্যা আপনার নিকট খুবই সমীচীন বোধ হইবে ; কিন্তু যদি আপনি অন্য কাহাকেও বাদ দেন, তখন হয়তো আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইবে, আপনি ব্যাখ্যা মানিতে চাহিবেন না। ইহার একমাত্র উপায়, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার আন্তরিক চেষ্টা করা। এই চেষ্টার ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বাদ দিবার কারণ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাইবেন। "আত্মানং বিদ্ধি"—"Know thyself"—ইহাই তো হইল সকল জ্ঞানের ভিত্তি। এই 'আপনাকে জানিবার' একটি উপায় মাত্র ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন। "If thou art true to thyself thou can'st not be false to any man"—এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু শুধু সংজ্ঞান মনের স্তরে আবদ্ধ থাকিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায় না। নিজেদের ভুলের পশ্চাতে যে একটি ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে, ইহা মানিয়া লইতে ইচ্ছুক নহি। নিজের ভুলের অর্থ যেমন নিজের কাছে চাপা দিয়া রাখি, পরের ভুলকেও সেই রকম নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি। এইজন্যই ভুলভ্রান্তিগুলি যে নিরর্থক, সাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ভুল সম্বন্ধে

মনঃসমীক্ষকদিগের ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে, মনের স্বভাব, আমাদের সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল প্রশ্নের উদয় হয়; পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সকল সমস্যার আলোচনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন

সাধারণ ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নির্জ্ঞান মনের কার্য্যধারা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম। আমাদের জীবনের আর একটি আপাততুচ্ছ সাধারণ ঘটনার বিষয়ে চর্চ্চা করিলে নির্জ্ঞান মনের আরও বিশদ পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা যে সমস্ত স্বপ্ন দেখি, তাহাদের যথাযথ ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের সহিতও নির্জ্ঞান মনের যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। কিন্তু স্বপ্নদর্শন এমন একটা সাধারণ ব্যাপার যে, ইহার যে আবার কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বা বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা থাকিতে পারে, তাহা অনেকেই হয়তো কল্পনাই করিতে পারিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, স্বপ্নে প্রায়শই এমন কতকগুলি অসম্ভব এবং উদ্ভট ঘটনার (সোনার পাহাড়, মানুষের চার পা, সাপের কথা কওয়া প্রভৃতি) সমাবেশ দেখা যায় যে, স্বপ্নালোচনা হইতে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে মনে করা বাতুলতারই নামান্তর। স্বপ্ন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা কিরূপেই বা সম্ভব? কারণ স্বপ্ন তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মনেই থাকে না। অন্যের নিকট বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্নবৃত্তান্তটি যে, ইচ্ছাকৃতভাবেই হউক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক, পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করে, তাহা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং এইরূপ নিছক সারশূন্য বস্তুর মূল্যই বা কি হইতে পারে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া মন সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই বা কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে?

এ কথা স্বীকার করিতে অবশ্য কোন দ্বিধা নাই যে, আমরা স্বপ্নকে সাধারণত তুচ্ছ এবং নিরর্থক বলিয়াই মনে করি। কিন্তু অনেক স্থলে যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, ইহাও কি সত্য নয়? ধরুন, যদি কেহ স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুটি, যিনি সম্প্রতি বিদেশে চাকুরি করিতে গিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া মরণাপন্ন অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছেন, বন্ধুটির সম্বন্ধে এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার পর ঘুম ভাঙিয়া গেলে তাঁহার মন কি কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত হইবে না, এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্বপ্নটিকে অলীক বা নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রবৃত্তি কি তাঁহার হইবে? আবার দেখুন, স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন, প্রায় সব দেশেই, বহুকাল হইতে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য যাহাই হউক, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, স্বপ্নকে একেবারে নিরর্থক বলিয়া কেহই মনে করেন না। ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না, সাপের স্বপ্ন দেখিলে সন্তানের জন্ম হয়, দুঃস্বপ্ন কাহাকেও বলিতে নাই, ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু স্বপ্নে বাপ মা তাহাকে আদর করিতেছে দেখিয়া হাসে এবং বাড়ি পুড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে, প্রভৃতি প্রবাদগুলি স্বপ্ন সম্বন্ধে কি মনোভাবের ইঙ্গিত করে? কথিত আছে যে, পুরাকালে প্রত্যেক রাজসভায় সভাপণ্ডিত, বিদূষক, সঙ্গীতাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারীও থাকিতেন। আলেকজাণ্ডার বিজয়াভিযানে বাহির হইয়া যখন টায়ার (Tyre) শহর অবরোধ করিলেন, টায়ারবাসীরা বহুদিন যাবৎ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাইয়াছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী বাধার ফলে, আলেকজাণ্ডার যখন অবরোধ আর চালাইবেন কি না ইতস্তত করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটি পরী বিজয়োল্লাসে নৃত্য করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ

স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারীদের ডাকাইয়া স্বপ্নটির অর্থ নিরূপণ করিতে বলিলেন। তাহারা একবাক্যে বলিল, স্বপ্ন তাঁহার জয়েরই সূচনা করিতেছে। ইহা শুনিয়া পরদিন আলেকজাণ্ডার বিপুল বেগে শত্রুদের আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদের পরাস্ত করিয়া টায়ার শহর জয় করিয়া লইলেন। আমাদের দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বপ্নকে অনেক সময় অতি উচ্চ আসন দেওয়া হয়। অনেক মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপনের মূলে স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বপ্নাদ্য মাদুলি ও ঔষধে আমাদের দেশে জনসাধারণের যে অগাধ বিশ্বাস আছে, তাহার প্রমাণ পদস্থ ব্যক্তির প্রশংসাপত্রসম্বলিত বিজ্ঞাপনের বহুলপ্রচার।

কেহ কেহ মনে করেন, স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বপ্নে কোন ব্যক্তির মৃত্যুদৃশ্য দেখা গেল এবং পরে জানা গেল, বাস্তবিকই সেই ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটিয়াছে—এইরূপ ঘটনার কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। বার ও তিথি ভেদে স্বপ্নের ফলাফল যে বিভিন্ন হইতে পারে, অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন। অতীত জীবনের, এমন কি পূর্ব্বজন্মেরও, কোন কোন ঘটনাবলীর কথা স্বপ্ন হইতে জানিতে পারা যায়, এইরূপ ধারণাও কেহ কেহ পোষণ করিয়া থাকেন।

স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এক দিকে স্বপ্নকে যেমন অসার ও অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়, অন্য দিকে তেমনই স্বপ্নকে অর্থপূর্ণ ও সারবান ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইবার বাসনাও দেখা যায়। আদিম যুগে স্বপ্নকে একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়াই মনে করা হইত। আধুনিক সভ্যযুগে স্বপ্নের প্রতি ততটা গুরুত্ব আরোপ না করিলেও, ইহা যে একেবারেই আজগুবি ব্যাপার—এ কথা মানিয়া লইতে সাধারণের যেন বাধা বোধ হয়। স্বপ্ন সম্বন্ধে সব দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদগুলি

ইহার প্রমাণ। আপনাদের মনে, বিশেষত আপনাদের মধ্যে যাঁহারা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে হয়তো এই সংশয় জাগিবে যে, এই বাধা বোধ হয় বলিয়াই কি ধরিয়া লইতে হইবে, স্বপ্ন একটি অর্থপূর্ণ বিশেষ ঘটনা! ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলা যায়। প্রথমত, যখন দেখিতেছি যে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে বেশির ভাগ লোকে স্বপ্নটি অর্থপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তখন ইহার মূলে যে কিছু সত্য থাকিতে পারে, তাহা ধরিয়া লইয়া স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা বোধ হয় অবৈজ্ঞানিক এবং অসমীচীন হইবে না। বিধিমত গবেষণার ফলে যদি সাধারণের স্বপ্ন সম্বন্ধে এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটে, তাহা হইলে তখন এই ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিব না। কোপারনিকাস (Copernicus) যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেই এই মত পোষণ করিতেন যে, পৃথিবী অচল, এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। জনসাধারণের এই মতের বিরুদ্ধে কোপারনিকাস যখন তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিলেন, তখন সকলেই নাকি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিল এবং তাঁহার মতবাদকে বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি, গবেষণার ফলে কোপারনিকাসের অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই মত মানিয়া লইতে আজ আমাদের কাহারও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। সেইরূপ, আলোচনার ফলে স্বপ্ন নিরর্থক বলিয়াই যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই তথ্য মানিয়া লইতে আমরা কিছুমাত্র আপত্তি করিব না। দ্বিতীয়ত, ভুলভ্রান্তি আলোচনার সময় বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকের নিকট কোন ঘটনাই তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্বপ্ন

একটি মানসিক ঘটনা, সুতরাং তাহা যত তুচ্ছই হউক, তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বৈজ্ঞানিকের অবশ্যকর্ত্তব্য। এই আলোচনাকে বাতুলতার পর্য্যায়ভুক্ত করিলে অবৈজ্ঞানিক মনোভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। বৈজ্ঞানিকেরাও যে স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই, তাহা নহে। আমরা এইবার সেই আলোচনার কথাই বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে স্বপ্নের প্রকৃতি এবং গুণাবলী সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। বাস্তবিক, স্বপ্ন কত রকমের হইতে পারে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহাদের মধ্যে এমন দুই-একটি গুণ নিশ্চয়ই আছে, যাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এগুলিকে স্বপ্ন বলি অর্থাৎ বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী হইতে পৃথকভাবে দেখি। দেখা যাউক, সেই বিশেষ লক্ষণগুলি কি হইতে পারে!

প্রথমেই বলা যাইতে পারে স্বপ্নের সহিত নিদ্রায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা। স্বপ্ন যে রকমের হউক না কেন, নিদ্রিত অবস্থায় মনোজীবনের একটি কার্য্যবিশেষ। জাগ্রত অবস্থার মানসিক কার্য্যাবলীর সহিত ইহার যে কোন সাদৃশ্যই নাই তাহা নহে, কিন্তু বিভিন্নতাও যথেষ্ট আছে। অনেক সময় স্বপ্ন দেখিয়া আমাদের ঘুম ভাঙিয়া যায়। স্বপ্নকে সেইজন্য জাগ্রত এবং নিদ্রিত এই দুইটির মাঝামাঝি একটি অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। তারপর দেখুন, আমরা কথায় বলি, স্বপ্ন দেখি ; স্বপ্ন শুনি—এ কথা কখনও বলি না। ইহা হইতে স্বপ্নের আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়াই কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় মানসিক কার্য্য প্রধানত দর্শনেন্দ্রিয়ের উপরেই নির্ভর করে।

ভাব, চিন্তা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও স্বপ্নে যে ব্যাপারগুলি ঘটে, সেগুলি মূলত দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। স্বপ্ন দেখা ঠিক নির্ব্বাক চলচ্চিত্র দেখার ন্যায়। নির্ব্বাক চলচ্চিত্রে যেরূপ একটির পর একটি ঘটনা পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত হয়, আর আমরা কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেগুলি উপভোগ করি, সেইরূপ স্বপ্নেও মনের পর্দ্দার উপর বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়া যায়, আমরা সেগুলি দর্শন করি। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি তখন ঘটনা-তাৎপর্য্য গ্রহণ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

এই দুইটি ভিন্ন, সকল স্বপ্নে সমভাবে প্রযোজ্য এমন আর কোন বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা যায় না। স্বপ্নাবলীর মধ্যে বৈষম্য কত প্রকারের হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। কোন কোন স্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী, তাহার বিষয়বস্তুতে হয়তো একটি মাত্র চিন্তা বা ঘটনাংশ প্রকাশ পায়। আবার অনেক স্বপ্নে ইহার ঠিক বিপরীতও হয়। সে-গুলিতে বহু ঘটনা বা চিন্তা প্রভৃতির সমাবেশে যেন একটি সম্পূর্ণ নাটক অভিনীত হইয়া যায়, কাজেই সে স্বপ্নগুলি দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। অনেক সময় স্বপ্নের ঘটনাবলী এমন স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয় যে, ঘুম ভাঙিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণের জন্য ঘটনাগুলি বাস্তব বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্বপ্নের ঘটনাসমূহ এত অস্বচ্ছ ও আবছা ভাবে দেখা যায় যে, বিশেষ চেষ্টা সহকারে স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে করিতে হয়। স্বপ্নে যে প্রায়শই আজগুবি ও অসম্ভব ঘটনাবলী দেখা যায়—এ কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু বেশির ভাগ স্বপ্নের উপাদান ওই ধরনের হইলেও এমন ঘটনাও স্বপ্নে দেখা যায়, যাহার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য আছে এবং যাহা বাস্তব জীবনে ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। হাত পা ছুঁড়িয়া অনেক উঁচুতে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছি এবং আড্ডায় বসিয়া রাজেনের সহিত ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব উত্তেজিতভাবে আলোচনা করিতেছি—এই

তুইটি স্বপ্নই দেখিয়াছি। বাস্তব জীবনে ঘটার সম্ভাবনার দিক হইতে প্রথম স্বপ্নটি যে আজগুবি—এ কথা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। ভুলিয়া যান বলিয়াই অনেকের ধারণা যে, তাঁহারা কখনও স্বপ্ন দেখেন না। স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া যাই—এ কথা অবশ্য ঠিক, কিন্তু সব স্বপ্ন যে আমরা সমানভাবে ভুলিয়া যাই, তাহা নহে। কোন স্বপ্ন নিদ্রা-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভুলিয়া যাই, কোন স্বপ্নের সবটাই বা কিয়দংশ হয়তো কিছুকাল মনে থাকে, আবার কোন স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে বহুদিবস যাবৎ, এমন কি কুড়ি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত, মনে থাকিতে পারে। চেষ্টা করিলে আপনিও হয়তো এই মুহূর্ত্তে বহুদিন পূর্ব্বের কোন একটি স্বপ্নের কথা মনে করিতে পারেন। আপনাদের এমন অভিজ্ঞতাও হয়তো আছে যে, নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্ন-বৃত্তান্তটা যে সম্পূর্ণ অলীক, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা সত্ত্বেও, স্বপ্নের দরুন একটি বিচলিত ভাব সারাদিনই অনুভব করিয়াছেন। আবার এমন স্বপ্নও দেখিয়াছেন যে, বিচলিত ভাব দূরে থাকুক, স্বপ্নটি আপনাদের মনে কোন রেখাপাতই করিল না।

বিভিন্ন স্বপ্নাবলীর মধ্যে কোথায় ঐক্য আছে দেখিলাম, এবং কি কি বিষয়ে অনৈক্য হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিলাম।

'শক্তু কলসের গল্প' বাল্যকালে আপনারা নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। গল্পটি মোটামুটি এইরূপ। এক দরিদ্র ছাতুওয়ালা কল্পনা করিতে লাগিল, ছাতু বিক্রয়ের দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া যশে সম্মানে রাজার সমকক্ষ হইয়াছে এবং সেই দেশের রাজার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। একদিন রাজকন্যা তাহার কথার অমান্য করায় সে রাগান্বিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার বাস্তব পদক্ষেপণের দ্বারা কলসীটি ভাঙিয়া চুরমার হইল এবং তাহার

কল্পনাসূত্র সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এইরূপ মানসিক ঘটনা অনেকের জীবনেই, বিশেষত তাহাদের যৌবনের প্রারম্ভেই, ঘটিয়া থাকে। আমরা সাধারণত ইহাকে দিবাস্বপ্ন বলি। আকৃতি ও বিষয়-বস্তু ভেদে দিবাস্বপ্ন নানা রকমের হইয়া থাকে। সব দিবাস্বপ্নের নায়কই দ্রষ্টা নিজে। দিবাস্বপ্নের বিষয়গুলিও স্বপ্নের ন্যায় দীর্ঘ বা ক্ষণস্থায়ী, একটি বা বহু ঘটনা সম্বলিত, সম্ভব বা অসম্ভব প্রভৃতি হইতে পারে। সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কি দিবাস্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে স্বপ্নের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়? তাহা করিলে কিন্তু যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ স্বপ্নের প্রধান লক্ষণ হইতেছে যে, উহা নিদ্রিত অবস্থার মানসিক কার্য্য। দিবাস্বপ্ন জাগ্রত অবস্থাতেই ঘটে। উপরন্তু যখন কোন ব্যক্তি দিবাস্বপ্ন দেখেন, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি যে কল্পনা করিতেছেন, এই জ্ঞান তাঁহার মনে থাকে। কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় সেই জ্ঞান থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে দিবাস্বপ্ন স্বপ্ন নহে, নিছক কল্পনা মাত্র। কিন্তু সব কল্পনাকে তো 'দিবাস্বপ্ন' আখ্যা দেওয়া হয় না, কেবল এই ধরনের কল্পনাকেই বা দেওয়া হয় কেন? ইহার কি কোন কারণ নাই? স্বপ্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলে, হয়তো সেই কারণের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। অনেক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন, শারীরতত্ত্বের (Physiology) দ্বারা স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, তাঁহাদের মতে স্বপ্ন সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারই শরীরের বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। একজন তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় নিদ্রা যাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, প্রখর রৌদ্রে সাহারার উষ্ণ মরুভূমিতে জলান্বেষণে তিনি ছুটাছুটি করিতেছেন। শরীরের আভ্যন্তরীণ কোন যন্ত্রের অসুখে ভুগিলে এমন

সব স্বপ্ন দেখা যায়, যেগুলির সহিত রোগাক্রান্ত যন্ত্রটির কোন না কোন যোগাযোগ আছে। যেমন হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন এমন এক ব্যক্তি অনেক সময় স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, কেহ যেন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, আর তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারিতেছেন না। কেহ স্বপ্ন দেখিলেন, দস্যু আসিয়া তাঁহার বাড়ি লুণ্ঠন করিতেছে, আর তিনি প্রাণপণে তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, চেষ্টার ফলে তাঁহার ডান হাতটি দস্যুর অস্ত্রে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং তিনি ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ডান হাতটি সত্যই কাটা গিয়াছে কি না! দেখিলেন যে, হাতের কিছুই হয় নাই, তবে বিশেষ অবস্থায় শুইবার জন্য রক্ত-চলাচলের স্বাভাবিক ধারা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায়, ডান হাতটি একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, এমন কি চিমটি কাটিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ ইঁদুরে ঘট উল্টাইয়া শব্দ করিয়া গেল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, চীনদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং আমার চতুর্দ্দিকে কামানের ভীষণ আওয়াজ হইতেছে। নিদ্রাকালে চক্ষুর সম্মুখে আলো জ্বালা থাকিলে, বাড়িতে আগুন লাগিয়া গিয়াছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। এই ধরনের স্বপ্নাবলীর উপর নির্ভর করিয়া শারীরতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শারীরিক প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ অঙ্গবিশেষের স্বাস্থ্য, দেহের অবস্থিতি বা নিদ্রাকালে বাহ্যিক কোন ঘটনার দরুন শরীরের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনাই স্বপ্ন দেখার মূল কারণ।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের এই মত অনুসরণ করিলে যে অনেক স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা অবশ্য খুবই সত্য। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বপ্নব্যাখ্যার সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে এই মত গ্রহণ করা

যায় না। সুহাসচন্দ্র সেদিন স্বপ্ন দেখিল, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ পৃথিবীতে কি করিয়া চিরশান্তি আনয়ন করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য তাহার ঘরে আসিয়াছেন। সুহাসের স্বাস্থ্য বেশ ভাল, তাহার শুইবার ঘরে সম্রাটের কোন ছবিই নাই। প্রবাসী এক পুরাতন বন্ধু অসুখে পড়িয়াছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া আমার একদিন ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। বন্ধুটির সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করি নাই। এই স্বপ্নগুলিকে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ যে ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, ঠিক সেই শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে কি ? শুধু তাহাই নহে। যদি ধরিয়াই লই যে, প্রত্যেক স্বপের সহিত কোন না কোনরূপ শারীরিক উত্তেজনার যোগাযোগ আছে, তাহা হইলেও এই মত সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। প্রথমেই দেখুন, কেহ স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঘর পুড়িয়া যাইতেছে এবং অনুসন্ধানে জানা গেল, শয়নকালে তাঁহার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। আর একবার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল এবং তিনিই স্বপ্ন দেখিলেন যে, বাড়ির ছেলেমেয়ের খুব তুবড়ি পোড়াইতেছে। এখানে কারণ এক থাকা সত্ত্বেও কার্য্যের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই, উদ্দীপক (Stimulus) এবং ব্যক্তিবিশেষ এক রহিল, অথচ বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন হইল। আবার এমনও হয় যে, ঘর পুড়িয়া যাইবার বা তুবড়ি জ্বালাইবার স্বপ্ন একজন দেখিলেন, কিন্তু শয়নকালে ঘরে আলোর লেশমাত্র ছিল না। এ ক্ষেত্রে, স্বপ্নের বিষয়, আগেকার স্বপ্ন দুইটির ন্যায় সম্পূর্ণ এক রকমের হইলেও কারণের বৈষম্য প্রকাশ পাইতেছে। এই তো গেল নিদ্রাকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত স্বপ্নবিষয়ের যোগাযোগের কথা। সেইরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত স্বপ্নবিষয়ের কতখানি সম্বন্ধ আছে, সে বিচার করিতে গেলেও অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত

বা সম্পূর্ণ নীরোগ ব্যক্তি উভয়েই নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া কষ্ট পাওয়ার স্বপ্ন দেখিতে পারেন। আবার রোগী ব্যক্তিটি নিশ্বাসের কষ্ট সম্বন্ধীয় স্বপ্ন না দেখিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখিতে পারেন। ইঁদুরে ঘট উল্টাইবার শব্দে স্বপ্নে কোন ক্ষেত্রে কামানের গর্জ্জনে এবং কোন ক্ষেত্রে পাঁচিল পড়িয়া যাওয়ার শব্দে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের এই বৈষম্যের হেতু কি? স্বপ্নের বিষয়বস্তু এক হইলেও কারণ বিভিন্ন হয় কেন? সম্ভব ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এই সকল রূপান্তরের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে সমস্ত আজগুবি বা অসম্ভব বিকৃতি আমরা অনেক সময় স্বপ্নে দেখিয়া থাকি, তাহা ব্যাখ্যা করিবার কোন সূত্রই আমরা এই তত্ত্ব হইতে পাই না। স্বপ্নের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বপ্ন আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। ইহার সম্বন্ধে এই প্রণালীর ব্যাখ্যা কোনরূপ আলোকপাতই করে না। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও শারীরতত্ত্ববিদেরা এই ভুলিয়া যাইবার কারণ সুসঙ্গতভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। শারীরিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে হয়তো কোন কোন স্বপ্নের জন্য দায়ী হইতে পারে, কিন্তু উহাই স্বপ্নের একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাখ্যা স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল নীতিই হইতেছে তাহার সর্ব্বব্যাপিতা।

শারীরতত্ত্বের ন্যায় মনস্তত্ত্বের দিক হইতেও স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা বহু পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-দেশীয় সাহিত্যে ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আমরা এই আলোচনার পরিচয় পাই। রবার্ট নামে একজন বৈজ্ঞানিক বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণের ফলে শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটি মত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে

গেলে, তাঁহার মতে, স্বপ্ন হইতেছে জাগ্রত অবস্থার ব্যাহত চিন্তারাশির পূর্ণবিকাশের একটি উপায় মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে অনেক চিন্তা নানা কারণে অসমাপ্ত অবস্থায় জমিয়া থাকে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া সেইগুলির পূর্ণ পরিণতি ঘটে। কেবলমাত্র দৈহিক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাই স্বপ্নের জন্য দায়ী নহে; বাধাপ্রাপ্ত মানসিক কোন উপাদান না থাকিলে স্বপ্ন ঘটিতে পারে না। তিনি আরও বলেন, মানসিক কোন ক্রিয়া ব্যাহত অবস্থায় জমিয়া থাকিলে মনে তীব্র অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয়, এবং স্বপ্নের কাজ হইতেছে, সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিয়া মনে শান্তি আনয়ন করা। ডিলাজও (Delage) মানসিক বৃত্তির প্রভাব ভিন্ন যে কোন স্বপ্নবৃত্তান্ত গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহা দেখাইয়াছেন। সার্নার (Scherner) বুড়্ডাক্ (Burdach); পুরকিন্জী (Purkinje) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ মানসিক বৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইঁহাদের পরস্পরের মতে অল্পবিস্তর অনৈক্য থাকিলেও এইটুকু আমরা জানিতে পারি, স্বপ্ন, শুধু শারীরিক নহে, মানসিক ক্রিয়া-কলাপের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ফ্রয়েড তাঁহার 'Interpretation of Dreams' পুস্তকে এই বিভিন্ন মতালবী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। স্বপ্নের সাধারণ তত্ত্ব-হিসাবে এই সকল অনুসন্ধানকারীদের মতামত মানিয়া লইবার পক্ষে একটি প্রতিবন্ধক আছে। ইঁহাদের প্রত্যেকেই, যে কোন কারণেই হউক, স্বপ্নের কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের গবেষণা চালাইয়াছিলেন। কাজেই স্বপ্নের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহাদের তত্ত্ব হইতে আমরা পাই না। মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা করিতে করিতে ফ্রয়েডও রোগীদের স্বপ্নের কথা জানিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন। রোগের লক্ষণের সহিত স্বপ্নের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে,

অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ প্রমাণ পাইয়া স্বপ্ন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে তিনি প্রবৃত্ত হন। রোগীদের ও সাধারণের বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া স্বপ্ন যে একটি মানসিক ব্যাপার এবং মনোবিদ্যার সাহায্য লইয়াই যে তাহা অধ্যয়ন করা সম্ভব ও সঙ্গত, এই সিদ্ধান্তে তিনি ক্রমশ উপনীত হন। কি উপায় অবলম্বন করিলে মনোবিদ্যার দিক হইতে স্বপ্ন সম্বন্ধে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের অধ্যয়ন এবং সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশও তিনি দিয়াছেন। স্বপ্ন আলোচনার জন্য ফ্রয়েড যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এইবার তাহার আলোচনা করিব।

মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ, আমরা তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। স্বপ্ন সম্বন্ধেও ফ্রয়েড এই মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। স্বপ্নবৃত্তান্তের বিভিন্ন অংশ লইয়া অবাধ ভাবানুষঙ্গ পন্থা অনুসরণ করিলে আমরা অবশেষে এমন কতকগুলি বাসনা ও চিন্তা প্রভৃতির সন্ধান পাই, যেগুলি স্বপ্নদ্রষ্টার নিতান্ত অন্তরের জিনিস। এই অন্তর্নিহিত বস্তুগুলির সমষ্টিকে স্বপ্নের "অব্যক্ত অংশ" (Latent Content) বলা হয়; এবং ঠিক যে সকল ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহার নাম স্বপ্নের "ব্যক্ত অংশ" (Patent or Manifest Content)। স্বপ্নের "ব্যক্ত অংশ" "অব্যক্ত অংশের"ই রূপান্তর মাত্র। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ-সাধারণত অর্থহীন, অসম্ভব বা খাপছাড়া বটে; কিন্তু যে অব্যক্ত অংশ-গুলির রূপান্তর আমরা স্বপ্নে দেখি, সেগুলি মোটেই খাপছাড়া নহে। তাহারা স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক জীবনের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি বিদ্যমান থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই রূপান্তরের কারণ কি, অব্যক্ত অংশ সোজাসুজি-ভাবে প্রকাশ না হইয়া এইরূপ বিকৃত আকারে হয় কেন? হয় এইজন্য যে, মনের প্রহরী (Censor) অব্যক্ত অংশটিকে স্বরূপে সংজ্ঞানে আসিতে

দেয় না। প্রহরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই ইহাকে নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়। এই মনের প্রহরীর কল্পনা মনোবিদ্যাজগতে ফ্রয়েডের একটি বিশিষ্ট দান। অবদমিত মানসিক ঘটনার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপ্রীতিকর কোন ঘটনাকে মন অবদমন করিয়া রাখে অর্থাৎ সংজ্ঞান হইতে নির্জ্ঞানে পাঠাইয়া দেয়। নির্জ্ঞান হইতে কোন বস্তু যাহাতে সংজ্ঞানে ফিরিয়া আসিতে না পারে, তাহার জন্যও মনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। মনের যে অংশ অবদমিত বস্তুর সংজ্ঞানে পুনরাগমনে বাধা দেয়, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন, মনের প্রহরী। আজকাল এই যুদ্ধের দিনে censor-এর কর্ত্তব্য কি, তাহা ধারণা করা খুবই সহজ। কোন্ সংবাদ প্রকাশ করা উচিত এবং কোন্‌টি প্রকাশ করিলে ক্ষতি হইবে, অতএব চাপিয়া যাওয়া উচিত, ইহা যেমন press-censor ঠিক করিয়া দেন, সেইরূপ মনের প্রহরীও নির্জ্ঞানের কোন্ চিন্তা বা ভাব সংজ্ঞানে আসিবার উপযুক্ত এবং কোন্‌টি নহে, সে বিষয়ে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু হাজার নিয়ন্ত্রণ ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও, সাঙ্কেতিক বা অনুরূপ আপাত-অর্থহীন উপায়ে অনেক গুপ্ত সংবাদ press-censor-এর সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মনের ক্ষেত্রেও, ছদ্মবেশ, রূপান্তর ও নানাপ্রকার সম্ভব ও অসম্ভব বিকৃতির মধ্য দিয়া অবদমিত অনেক বস্তুই স্বপ্নে প্রকাশ পায়। এই রূপান্তরের আবার বিভিন্ন প্রণালী আছে, এলোমেলোভাবে হয় না। কোন্ অব্যক্ত অংশ কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ রূপান্তর গ্রহণ করিবে, সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড কতকগুলি বিশেষ সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন। এইগুলি সম্বন্ধে আমরা এখনই আলোচনা করিব। সূত্রগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, স্বপ্ন-ব্যাখ্যার পথে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিব।

প্রথম সূত্রটির নাম সংক্ষেপন (condensation)। স্বপ্নে আমরা যতটুকু দেখি, স্বপ্নের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি, অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ অপেক্ষা অব্যক্ত অংশের পরিমাণ ও ব্যাপকতা অধিক। ব্যক্ত অংশের একটি প্রকরণ (item) অনেক সময়েই অব্যক্ত অংশের দুই বা ততোধিক প্রকরণের সংমিশ্রণের ফল। এই সংক্ষেপন নানা উপায়ে ঘটিতে পারে। স্বপ্নে দৃষ্ট একটি ব্যক্তি সমগুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারে, অথবা বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সংমিশ্রণ হইয়া স্বপ্নে একটি নূতন মানুষের সৃষ্টি হইতে পারে। সেইরূপ অব্যক্ত অংশের প্রকরণগুলি, যেমন—বাসনা, ইচ্ছা, স্থান, ব্যক্তি, নাম প্রভৃতি, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নে একটি আজগুবি প্রকরণের সৃষ্টি করিতে পারে। গর্দ্দভের মস্তিষ্কযুক্ত কোন পরিচিত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলে, সেই ব্যক্তির বুদ্ধি সম্বন্ধে স্বপ্ন-দ্রষ্টা কি ধারণা পোষণ করেন, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। সংবাদপত্রে বা মাসিক-পত্রিকায় রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া যে সকল ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা আপনাদের স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বপ্নে দৃষ্ট একটি প্রকরণ, যে সমস্ত প্রকরণের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে, কোন ক্ষেত্রে তাহাদের একটিকে, কোন ক্ষেত্রে তাহাদের দুইটিকে এবং কোন ক্ষেত্রে সবগুলিকেই বুঝাইতে পারে। একটির অধিক প্রকরণকে ইঙ্গিত করার নাম "অতিলক্ষ্য" (overdetermination)। "বাগবাজারে আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি থাকেন, আবার বাগবাজারে রসগোল্লাও পাওয়া যায়। স্বপ্নে বাগবাজার দেখার অর্থ, ওইরূপ ক্ষেত্রে আমার প্রিয় ব্যক্তির নিকট যাওয়াও বটে এবং রসগোল্লা খাওয়াও বটে।"* ব্যক্ত অংশের একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ, অব্যক্ত অংশের

* শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু: 'স্বপ্ন', ১ম সং., পৃ. ৬৭

কোন্ প্রকরণ বা প্রকরণগুলিকে নির্দ্দেশ করিতেছে, অবাধ ভাবানুষঙ্গ পন্থা অবলম্বন না করিলে তাহা বুঝিতে পারা একান্তই অসম্ভব।

অব্যক্ত অংশ হইতে ব্যক্ত অংশে পরিণতির দ্বিতীয় সূত্রটির নাম অভিক্রান্তি (Displacement)। অব্যক্ত অংশের কোন একটি প্রকরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক প্রকরণের রূপ ধরিয়া প্রকাশ হইতে পারে। এইজন্য স্বপ্নের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। যেমন, সুহাস সেদিন যদিও স্বপ্নে সম্রাটকে দেখিয়াছিল, কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে জানা গেল যে, স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ সম্রাটের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিহীন আর এক ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার এমন অভিক্রান্তিও হয়, যাহার ফলে অব্যক্ত অংশে যে সকল প্রকরণ থাকে ব্যক্ত অংশে প্রকাশকালে তাহাদের পরস্পরের গুরুত্বের মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটে। যেমন স্বপ্নে হিংস্র ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় হইল না, অথচ সেই স্বপ্নেই নিরীহ একটি মেষশাবক দেখিয়া ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাঘ দেখিয়া ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক, মেষশাবক দেখিয়া নহে, কিন্তু অভিক্রান্তিবশত স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে এরূপ ওলট-পালট ঘটিয়াছে।

স্বপ্নের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অব্যক্ত অংশের সমস্ত প্রকরণই দার্শন প্রতিরূপ-(visual imagery)-এর আকারে পরিণত হইয়া ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ স্বপ্ন আমরা **দেখি**। অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কোন ঘটনা দেখাইতে হইলে নাটকে যেমন তাহাকে বর্ত্তমানের রূপ দিতে হয় (ত্রেতাযুগের সীতা যেমন কলিযুগে আমেরিকায় মিসেস রাম রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন), স্বপ্নেও তেমন বর্ত্তমানের রূপ না দিয়া অতীত অথবা ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করা যায় না। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে অব্যক্ত অংশের সমস্ত বস্তু বর্ত্তমানের দৃশ্য ঘটনাবলীর চিত্রে

রূপান্তরিত হয়, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন—নাটন (Dramatisation)। কলেজের ছুটি হইলে কার্সিয়ং যাইব—ভাবী ঘটনার এই ইচ্ছাটি স্বপ্নে—কলেজের ছুটি হইল, দার্জ্জিলিং মেলে উঠিলাম, ট্রেন ছাড়িয়া দিল, এইরূপ চিত্রাবলীর ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।

বিভিন্ন প্রকরণের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ, বৈপরীত্য, সাদৃশ্য প্রভৃতি, বা গুণবাচক (adjectives and adverbs), নঙর্থক (negatives), সংযোজক (conjunctions) ইত্যাদি পদগুলি কিরূপ ভাবে ব্যক্ত অংশে প্রকাশ পায়, সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনঃসমীক্ষকেরা বিশেষ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া আরও অনেক তথ্যের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কোন একটি দ্রব্যের উপর যে আমার স্বত্বাধিকার আছে, স্বপ্নে ইহা ব্যক্ত করিবার একটি উপায় হইতেছে যে দ্রব্যটির উপর আমি বসিয়া আছি। 'অধিকার' এই অমূর্ত্ত সম্পর্কটি 'দ্রব্যটির উপর বসিয়া থাকা' এই মূর্ত্ত চিত্রটির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইল।

বিশ্লেষণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, অন্যের নিকট বলিবার সময় স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কোন দৃষ্ট অংশ হয়তো বাদ পড়িয়া যায়, আবার কোন নূতন অদৃষ্ট অংশ হয়তো আসিয়া পড়ে। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্নের এই যে পরিবর্ত্তন হয়, মনঃসমীক্ষকেরা ইহার নাম দিয়াছেন অনুযোজনা (Secondary elaboration)।

মোটামুটিভাবে রূপান্তরের প্রধান সূত্রগুলির কথা বলিলাম। কিন্তু শুধু এই সূত্রগুলির বিষয় অবগত হইলেই যে স্বপ্নের বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইবে, এরূপ ধারণা করা সমীচীন নহে। সংক্ষেপন,

অভিক্রান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বপ্নের আকৃতির গঠন-প্রণালীর নির্দ্দেশ করে মাত্র। কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিই তো সব নয়; বস্তুবিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার আকৃতি ও গঠন-প্রণালী যেমন জানা প্রয়োজন, তাহার প্রকৃতির বিষয়েও তেমনই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। স্বপ্ন সম্বন্ধেও এ যুক্তি প্রযোজ্য। স্বপ্নের প্রকৃতি, অর্থাৎ ইহার উপাদান, অর্থ প্রভৃতি সবিশেষ জানিতে না পারিলে ইহার সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে এখনও পর্য্যন্ত কিছু বলা হয় নাই; সুতরাং এইবার সেই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছা-পরিপূরক, অর্থাৎ যে সমস্ত আশা কামনা প্রভৃতি বাস্তব জীবনে জাগ্রত অবস্থায় পূর্ণ হইতে পায় না বা পারে না, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে তাহা পূর্ণ হয়। সুতরাং স্বপ্নের উপাদান হইল ইচ্ছা, এবং মানসিক জীবনে তাহার কার্য্য হইল সেই ইচ্ছা পূরণ করা। শিশুরা যে স্বপ্ন দেখে, মনোযোগের সহিত সেগুলি লক্ষ্য করিলে এই তথ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খেলিবার জন্য বল কিনিয়া দিবেন অথবা ছুটিতে আলিপুরে পশুশালায় লইয়া যাইবেন বলিয়া আপনি আপনার পুত্র 'বোকা'কে আশ্বাস দিলেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে কোনটিই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বোকা রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যে, সে মহোল্লাসে ভ্রাতা বোঁচার সহিত বল লইয়া খেলা করিতেছে অথবা পশুশালায় হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়াইতেছে। জাগ্রত অবস্থায় ব্যাহত ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থ হইল।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন, এইরূপ ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া যদি ফ্রয়েডের স্বপ্ন সম্বন্ধে মতামত গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং মনোযোগের সহিত অধ্যয়নের

অযোগ্য। কারণ এই অত্যন্ত লঘু ও ক্ষুদ্রপরিসর ভিত্তির উপর কোন কিছুই গড়িয়া তোলা চলে না। উপরন্তু, ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও তথ্যটির বিরুদ্ধেও প্রচুর আপত্তির কথা আপনাদের মনে জাগিতেছে। 'স্বপ্ন ইচ্ছা-পরিপূরক'—তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? কোন সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও এ তথ্য মানিয়া লইতে পারে? সেদিন প্রবাসী বন্ধুর অসুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার ইচ্ছা ছিল, বন্ধুটির অসুখ হউক? বিশিষ্ট কোন নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যুর স্বপ্ন বোধ হয় সকলেই কোন না কোন সময়ে দেখিয়াছেন, তাহা হইলে কি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, আত্মীয়ের মৃত্যুর বাসনা স্বপ্নদ্রষ্টার মনে জাগিয়াছিল? উপরন্তু, যে সমস্ত আজগুবি বস্তু বা অসম্ভব ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহাদের ব্যাখ্যা কি করিয়া হইবে? দেবেন মিত্রের ব্রহ্মার মত পাঁচটি মুখ হউক—এ ইচ্ছা আমি কোন দিনই করি নাই, কারণ তাহার একটি মুখের বাক্য-স্রোতেই আমরা সকলে ভাসিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তবু স্বপ্নে পঞ্চমুখ দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলাম। কি একটি সিনেমার ছবি দেখিয়া আসিয়া রাত্রে দীপু স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, সে রেলযোগে আকাশ-পরিভ্রমণ করিতেছে এবং যাহাতে উত্তাপ আদৌ না লাগে তাই সূর্য্যের পিছন দিক দিয়া যাইতেছে। এই জাতীয় স্বপ্নে কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ হয়?

এই ধরনের নানারূপ আপত্তির কথা মনে হওয়া খুবই স্বভাবিক। কিন্তু আমরা শীঘ্রই উপলব্ধি করিব, আপত্তিগুলি যেরূপ মারাত্মক বলিয়া মনে হইতেছে, আসলে সেগুলি আদৌ সেরূপ নহে। এমন কি, সেগুলি আপত্তি হিসাবে বিবেচিত হইতেই পারে না। ফ্রয়েডের তথ্য খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত ঘটনাবলীর কোনটিই বিপরীত যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা চলে না।

প্রথমেই বলি, শিশুদের স্বপ্নাবলী ফ্রয়েডের তথ্যের ভিত্তি নয়, দৃষ্টান্ত মাত্র। স্বপ্নতত্ত্ব ফ্রয়েডের প্রথম অনুসন্ধানের বিষয় ছিল না। মানসিক রোগের চিকিৎসা করিতে করিতে স্বপ্নের সহিত রোগ-লক্ষণের এবং রোগীর ব্যবহারের যোগাযোগ আছে লক্ষ্য করিয়া তিনি স্বপ্ন বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তথ্য রোগী এবং নীরোগ, সকল বয়সের এবং বিভিন্ন দেশের স্ত্রী ও পুরুষের বহু স্বপ্নাবলী নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণের ফল। কাজেই ভিত্তি তরল এবং অসার নহে, পরন্তু দৃঢ় ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

ইচ্ছা শব্দটি সচরাচর আমাদের জ্ঞাত ইচ্ছা অর্থাৎ যে ইচ্ছা আমাদের সংজ্ঞানে আছে সেই ইচ্ছা—এই অর্থে ব্যবহার করি। ইহাই ফ্রয়েডের তথ্য ভুল বুঝিবার একটি কারণ। ফ্রয়েড তাঁহার স্বপ্নতত্ত্বে কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, শুধু সংজ্ঞানে নয়, আসংজ্ঞানে এবং বিশেষ করিয়া নির্জ্ঞানে যে ইচ্ছা থাকে, স্বপ্নে তাহাই চরিতার্থ হয়। অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানে প্রাণহীন জড় অবস্থায় পড়িয়া থাকে না, ক্রমাগতই প্রহরীকে এড়াইয়া সংজ্ঞানে আসিবার চেষ্টা করে। স্বরূপে সোজাসুজিভাবে আসিতে পারে না বলিয়া নানারূপ বিকৃতির মধ্য দিয়া তাহারা সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন, শুচিবাইয়ের ন্যায় নানারূপ বাই, মানসিক রোগ, এ সমস্তই অবদমিত ইচ্ছার মনের প্রহরীর সহিত সংঘাতের ফল।

স্বপ্নে যে নিকট-আত্মীয়কে দেখিয়াছিলেন, তিনি হয়তো অন্য এক ব্যক্তির প্রতীকরূপেই আসিয়াছিলেন, সুতরাং দৃষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু-কামনা আপনি করিয়াছিলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লওয়া সঙ্গত নয়। অনুসন্ধান করিতে হইবে, ব্যক্ত অংশে দৃষ্ট ব্যক্তি অব্যক্ত অংশে কাহাকে নির্দেশ

করিতেছে। এ অনুসন্ধানের একমাত্র উপায় অবাধ ভাবানুষঙ্গ-প্রণালী। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত অংশের অন্যান্য প্রকরণগুলিও বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তবেই স্বপ্নব্যাখ্যা সম্ভব হইবে। দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বপ্নব্যাখ্যার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তাই অতীব দুরূহ। ক্ষুদ্র একটি স্বপ্ন যাহা দুই লাইনে লিখিয়া ফেলা যায়, অবাধ ভাবানুষঙ্গ-প্রণালীর সাহায্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত চিন্তা ভাব প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে হয়তো দুই সহস্র লাইনও যথেষ্ট হইবে না। আরও একটি কথা আছে। একের স্বপ্নের ব্যাখ্যা অপরের নিকট কখনই যেন তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। তাহার কারণেরও ইঙ্গিত করা যায়। ভুলভ্রান্তি ব্যাখ্যা করিতে সাধারণত মনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে হয় না। উপর দিকের স্তর হইতেই তাহাদের হেতুর সন্ধান পাওয়া যায়। একদেশবাসী ব্যক্তিদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন মোটামুটি একই রকম, একই সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক পরিবেষ্টনীও তেমনই অনেকাংশে একই প্রকার। পরস্পরের মনের উপর দিককার স্তরে তাই যথেষ্ট মিল থাকে। সেইজন্য একজনের ভুল-ভ্রান্তির ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে অপরে বিশেষ আপত্তি করে না। কিন্তু স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিতে হইলে মনের বহু নিম্নস্তর পর্য্যন্ত যাইতে হয়। পরস্পরের মনের সেই গভীর দেশে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক। তাই একই ধরনের স্বপ্ন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে, এবং সেইজন্যই একের স্বপ্নের ব্যাখ্যা অন্যে মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করে। গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নিজের নির্জ্ঞান সম্বন্ধে যতই সচেতন হওয়া যায়, ততই এই দ্বিধা দূরীভূত হইতে থাকে।

দিবসের জাগ্রত অবস্থার কোন একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন রচিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন্ রুদ্ধ ইচ্ছা সফল

হইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নদ্রষ্টার বাল্যজীবন পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে হয়। সুতরাং শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকিলে স্বপ্নের সুচারু ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা সফল না হইবারই সম্ভাবনা। মনঃসমীক্ষকেরা তাই শিশুমন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। অধুনা কয়েকটি বিশিষ্ট মহিলা সমীক্ষক (Anna Freud, Helene Deutsch, Melanie Klein প্রভৃতি) অধ্যবসায়ের সহিত এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। শিশুমনের গতি, বিশেষ করিয়া শিশুদের কামজীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদেরও পরে চর্চ্চা করিতে হইবে।

স্বপ্নে প্রতীকের (symbols) ব্যবহার বিস্তৃতভাবে হইয়া থাকে। অব্যক্ত অংশের প্রকরণগুলি কখনও রূপক কখনও প্রতীকের সাহায্যে আত্মগোপন করিয়া ব্যক্ত অংশে আসে। রূপক এবং প্রতীককে কিন্তু একই বস্তু বলা চলে না। গিরীন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকে বিষয়টি পরিষ্কার-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রূপক ও প্রতীকে প্রভেদ আছে। দেহতত্ত্বের গানে যখন আত্মাকে পাখী বা দেহকে পিঞ্জর বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন তাহা রূপক মাত্র। এই রূপকের অর্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যদি কেহ সাপের উপাসনা করেন, অথচ কেন যে সাপকে দেবতা ভাবিতেছেন তাহা যদি তাঁহার জানা না থাকে, তবেই সাপকে প্রতীক বলা চলে। অবশ্য সকল প্রতীকেরই আমরা একটা মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রতীকের বিশেষত্ব এই, তাহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেও মন তাহা মানিতে চায় না।"* প্রতীকের আর একটি বিশেষত্ব বোধ হয় এই বলা যায় যে, প্রায়

* 'স্বপ্ন' ১ম সং., পৃ. ১১০।

সর্ব্ব দেশেই সর্ব্ব সময়েই একটি প্রতীক একই বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কাজেই প্রতীককে সার্ব্বজনীন বলিয়া ধরিয়া লইলে বিশেষ ভুল করা হয় না। যেমন সাপ সর্ব্বত্রই পুংলিঙ্গের, বাক্স স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের, রাজা পিতার, রাণী মাতার, গৃহ দেহের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের বহু প্রতীকের কথা আপনারা সহজেই মনে করিতে পারিবেন।

প্রতীকগুলি মনঃসমীক্ষকদিগের সৃষ্টি নয়, এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। মনঃসমীক্ষণের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রতীকগুলির অর্থ সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। একটি কথা কিন্তু এ সম্বন্ধে বলিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। অভিধানের সাহায্যে বিদেশীয় কথাগুলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে পারিলেই যেরূপ বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত বক্তব্যটির অর্থ উপলব্ধি করা যায়, স্বপ্নে দৃষ্ট প্রতীকগুলির অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই সেইরূপ স্বপ্নের অর্থটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, এ ধারণা কেহ যেন ক্ষণকালের জন্যও মনে স্থান না দেন। অনেক "বৈজ্ঞানিক" পুস্তক এবং অনেক "জ্ঞানী" ব্যক্তির নিকট স্বপ্নাবলীর ওই ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে ব্যাখ্যা গ্রহণ না করাই সমীচীন।

প্রতীকগুলি যেমন সার্ব্বজনীন, তেমনই কতকগুলি স্বপ্নও সার্ব্বজনীন বলিয়া মনে হয়। শূন্যে উড়িয়া বেড়ানো, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া যাওয়া, নগ্ন অবস্থায় জনতার মধ্যে বিচরণ করা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া প্রভৃতির কোনও একটি বা ততোধিক স্বপ্ন সকলেই কোন না কোন সময় দেখিয়া থাকিবেন। সম্ভবত যৌবনের প্রারম্ভে ও তৎপূর্ব্বেই এরূপ স্বপ্ন দেখা যায়। কলেজে অধ্যয়নকালে সহপাঠী সুশীল একটি স্বপ্ন বার বার একই ভাবে দেখার কথা প্রায়ই বলিত। স্বপ্নটি এই—বিশেষ উচ্চ নয় এরূপ একটি তক্তাপোশের উপর শুইয়া সে নিদ্রা যাইতেছে,

পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবার সময় হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। এই সকল সার্ব্বজনীন স্বপ্ন (typical dreams) সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সময়ে একই কারণে ঘটে কি না, অর্থাৎ একই রুদ্ধ ইচ্ছা প্রকাশ করে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে, স্থিরনির্ণয় এখনও হয় নাই। সম্ভবত দেশকাল-ভেদে এই জাতীয় স্বপ্নের অর্থের তারতম্য ঘটে।

স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কি না, এ বিষয়ে অনেকেরই কৌতূহল আছে। স্বপ্ন দেখিলাম, অমুক ব্যক্তি অমুক সময় মারা গিয়াছেন; তাহার পর খবর পাইলাম, ঠিক সেই সময় সেই ব্যক্তি সত্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এরূপ অভিজ্ঞতার কথা অনেকেই বলিবেন। তাঁহারা প্রশ্ন করিবেন, ইহা হইতে কি প্রমাণ হয় না যে, স্বপ্নের অর্থ হইতেছে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত করা? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত স্বপ্নের সহিত বাস্তবের এইরূপ আশ্চর্য্য মিল হইয়া যাইবার বিবরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না। বিপরীত দৃষ্টান্তের সংখ্যাই বরং অনেক বেশি। ডার্বিতে প্রথম পুরস্কার পাইবার স্বপ্ন কয়জনের ভাগ্যে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে? দ্বিতীয়ত, স্বপ্ন দেখা একটি ঘটনা, তাহার সহিত বাস্তবের মিল হইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটির নানা কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম ঘটনাটির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হইবে না। উপরন্তু, স্বপ্ন ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত করে—এ তথ্য মানিয়া লইলে অধিকাংশ স্বপ্নেরই কোন অর্থই করা যাইবে না। সুতরাং এই তথ্য অপেক্ষা ফ্রয়েডের তথ্য যে অধিকতর ব্যাপক ও কার্য্যকরী, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

স্বপ্ন ইচ্ছা পূর্ণ করে, এই মতের বিরুদ্ধে আর এক দিক হইতে উপরি-উক্ত আপত্তিগুলি অপেক্ষা গুরুতর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা

যাইতে পারে। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আনন্দই হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। আশার ছলনা, ইচ্ছার পরাভব—ইহাই তো আমাদের জীবনের অধিকাংশ দুঃখ-অশান্তির মূল! স্বপ্নের কার্য্য যদি হয় ইচ্ছার পূরণ করা, তাহা হইলে স্বপ্নমাত্রই আনন্দপ্রদ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সব স্বপ্নই কি সুখের স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত কি বিরল?

স্বীকার করিতেই হইবে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বপ্ন দেখার ফলে কখনও কখনও আশঙ্কায় ঘুম ভাঙিয়া যায়, এ কথা খুবই সত্য। এই জাতীয় স্বপ্নকে মনঃসমীক্ষকেরা উৎকণ্ঠা-স্বপ্ন (anxiety dreams) বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও ফ্রয়েডের তথ্য বর্জ্জন করিবার কোন কারণ নাই। স্বপ্নে অবদমিত ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কি ধরনের ইচ্ছা অবদমিত হয় এবং অবদমন-ক্রিয়া মানসিক জীবনে কখন হইতে আরম্ভ হইয়া কি ভাবে চলিতে থাকে, সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইলে উৎকণ্ঠা-স্বপ্নের রহস্য ভেদ করিতে কষ্ট পাইতে হয় না। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, নিছক ইচ্ছা করিবার পথে মানুষের মনের কোন বাধাই নাই। এমন অনেক ইচ্ছাই মানুষ করিয়া বসে, যাহা সফল হইলে বিপদেরই কারণ হইয়া পড়ে। কোন কোন ইচ্ছা যে অপূর্ণ থাকে, তাহা সুখেরই বিষয়, দুঃখের নহে। কবি সেইজন্যই গাহিয়াছেন, "আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে।" যাহা স্পর্শ করিব তাহাই স্বর্ণ হইয়া যাইবে, এ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া মিডাসের (Midas) পক্ষে সুখের বিষয় হয় নাই। যাহাতে হাত দিব তাহাই ছাই হইয়া যাইবে, মহাদেবের নিকট এই বর পাইয়া ধূম্রলোচনকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল। শিশুদের মনে এমন কতকগুলি ইচ্ছা জাগে, যেগুলি পূর্ণ হইলে তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে এ

আশঙ্কা তাহারা করে; তাই সেই ইচ্ছাগুলিকে তাহারা মন হইতে তাড়াইয়া দেয় অর্থাৎ নির্জ্ঞানে পাঠাইয়া দেয়। নির্জ্ঞানে সেই সব অবদমিত ইচ্ছার সহিত আশঙ্কা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকে। স্বপ্নে সেই ধরনের ইচ্ছা যখন পূর্ণ হইবার পথে অগ্রসর হয়, তখন তৎসহ জড়িত আশঙ্কাও সংজ্ঞানে আসিতে থাকে। কিন্তু এ আতঙ্ক সংজ্ঞান মনের অসহ্য। তাই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। তখন 'ইহা স্বপ্নমাত্র' এই আশ্বাস পাইয়া মন এই আতঙ্কের কবল হইতে পরিত্রাণ পায়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে সব কথাই যে বলা হইল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মনঃসমীক্ষকেরা বিষয়টির যেরূপ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মূল কয়েকটি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। জিজ্ঞাসুদের শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু-প্রণীত 'স্বপ্ন' পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মানসিক ঘটনাবলী—শুধু মানসিক কেন, নৈসর্গিক ঘটনাবলীও বটে—এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যে, কোনও একটি বিষয় সুচারুভাবে বুঝিতে হইলে অন্যান্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাও একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পরবর্তী প্রবন্ধে তাই অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইবে।

২য় সংস্করণ, ১৯৪৫, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মনের গঠন ও ক্রমবিকাশ

দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণ দ্বারা মন কি ভাবে কার্য্য করে, তাহার কিছু পবিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। নানাবিধ মানসিক ব্যাধির উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া সমীক্ষকেরা মনের প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যের রীতিনীতি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। ব্যাধিগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ এখানে করিব না।* যে কোন বস্তুই আলোচনার বিষয় হউক না কেন, ক্রমাগত বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিলে একটি বিশেষ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন দিক হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে না পারিলে বস্তুটি সম্বন্ধে একটি অসম্বদ্ধ খাপছাড়া রকমের ধারণার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং বিশ্লেষণের পথে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া যে সকল সূত্র সমীক্ষকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের ফলে মনের গঠন ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কি নূতন জ্ঞান আমরা লাভ করিলাম, তাহার বরং একটি যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ও সুসম্বদ্ধ বিবরণ দিবার চেষ্টা করা যাউক।

মন বলিতে আমরা সাধারণত কি বুঝি, মন সম্বন্ধে আমরা কি

* সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানসিক বিকার কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার উদাহরণ 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় "সংবাদ-সাহিত্যে" মধ্যে মধ্যে আমাদের দিয়া থাকেন।

জানি? নিজেকে যদি এই প্রশ্ন করেন ও একটু ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই উপলব্ধি করিবেন, যে, যাহাকে পূর্ব্বে সংজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহার কার্য্যাবলীকেই আমরা মনের কাজ বলিয়া বুঝি। অর্থাৎ যে সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছা, বিক্ষোভ প্রভৃতি বিষয়ে আমরা সচেতন, সেইগুলিকে আমরা মানসিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করি, সেইগুলিকেই মনের অস্তিত্বের পরিচয় বলিয়া ধরিয়া লই। মনোবিদ্যার চর্চ্চা না করিয়াও মন সম্বন্ধে আরও একটি কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেটি এই যে, মনের সহিত দেহের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বস্তুত দেহের ভিতর দিয়াই মন আপনাকে প্রকাশ করে। (বলিয়া রাখা প্রয়োজন, মন-বিষয়ক কোন দার্শনিক তথ্যের আলোচনা করা উপস্থিত আমার উদ্দেশ্য নয়। দার্শনিক হউন, বৈজ্ঞানিক হউন, অথবা মুটে বা মজুর বা সাধারণ স্ত্রীলোক বা পুরুষ হউন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই মন সম্বন্ধে যে সহজ ও সাক্ষাৎ (immediate) অভিজ্ঞতা আছে, আমি এখানে তাহার কথাই বলিতেছি।) সংজ্ঞান ও দেহের সহিত নিকট-সম্পর্ক—এই দুইটিই হইল মন-বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানের প্রথম সোপান। তারপর শিশুমন ও তাহার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। দেখিতে পাই, প্রত্যেক শিশুই কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, বয়োবৃদ্ধির সহিত যেগুলির লক্ষ্যের ও কার্য্যক্ষেত্রের কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিতে থাকে। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ইংরেজী নাম—Instincts। এই প্রবৃত্তিগুলিই শিশুমনের একমাত্র সম্বল ও মানসিক জীবনের আদি উপকরণ। ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, কিন্তু কার্য্যের ভিতর দিয়া ইহাদের শক্তির (energy) বিকাশ দেখিতে পাই ও ইহাদের যথেষ্ট পরিচয় পাই। প্রথম অবস্থায় সমস্ত মনটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহারা সম্পূর্ণভাবে মনটিকে

অধিকার করিয়া থাকে। মনের এই আদি অবস্থার ফ্রয়েড নাম দিয়াছেন—অদস্ (Id. Id ল্যাটিন কথা, ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ It)। তাহা হইলে অদস্ বলিতে আমরা বুঝিব, মনের সেই প্রাচীনতম অবস্থা যখন অজ্ঞাতস্বরূপ সহজাত প্রবৃত্তি ভিন্ন মনে আর কিছুই নাই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রবৃত্তিগুলি সমস্ত মানসিক বৃত্তির উপর আধিপত্য বজায় রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে ইহাদের নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। জীবনে অদসের প্রভাব তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অন্তরের প্রবৃত্তিগুলি মাত্র সম্বল করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, স্থান হয় তাহার এই বাস্তব জগতের মধ্যে। বাহিরের জগতের আকাশ, আলো, বাতাস, জল, পরিবারবর্গের আদর, অনাদর, ভালবাসা, বিরক্তি শিশু জন্ম লইবার পর হইতেই তাহার মনের উপর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহাদের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দেয়। কাজেই অদস্ অবিচলিত থাকিতে পারে না। বহির্জগতের সহিত আপোস মীমাংসা করিবার জন্য এবং বহির্জগতের অত্যধিক উত্তেজনার হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অদসের এক অংশের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। অদসের যে অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার কার্য্যভার গ্রহণ করে, তাহার নাম অহম্ (Ego)। সুতরাং অদস্ এবং বহির্জগৎ এই উভয়ের মধ্যে অহমের স্থান। শরীরের কার্য্যকলাপ প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত করিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া এবং সুবিধামত বহির্জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া অহম্ আপনাকে বাঁচাইয়া রাখে। সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিয়া, কোন প্রবৃত্তিকে কার্য্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়া, কোনটিকে দমন করিয়া ইহা অদস্‌কে বশীভূত করিবার প্রয়াস পায়। যে কোন কারণবশতই হউক, অত্যধিক আভ্যন্তরীণ

উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে অ-সুখ অনুভূত হয়, উত্তেজনার উপশমে সুখবোধ হয়। অ-সুখ দূর করিয়া সুখ আনিবার চেষ্টা অহমেরই কাজ। বহির্জগৎ এবং অদস্—দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের অবিরাম পরিশ্রম হইতে অহম্ মধ্যে মধ্যে অবসর গ্রহণ করিয়া কূর্ম্মের মত আপনার মধ্যে আপনি গুটাইয়া আসে। বাহিরের সহিত সম্বন্ধ তখন তাহার ক্ষীণ হইয়া আসে, নিদ্রাবস্থা ইহারই একটি দৃষ্টান্ত।

মানুষের শৈশবকাল অন্যান্য সমস্ত জন্তুর শৈশবকাল হইতে দীর্ঘতর। এই দীর্ঘ শৈশবকাল শিশু তাহার মাতাপিতা প্রভৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াই অতিবাহিত করে। তাঁহাদের আদেশ, নিষেধ, ধরনধারণের দ্বারাই শিশুর প্রায় প্রত্যেক কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহাদের শাসন চিরকাল সমভাবে চলে না, বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশু নিজেই নিজেকে শাসন করিবার ভার গ্রহণ করে। অহমের যে অংশ এই শাসনের ভার গ্রহণ করে, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন—অধিশাস্তা (Super-ego)। মনের ক্রমপরিণতি যখন এই অবস্থায় আসিয়া পৌছায়, তখন কোন্ ক্ষেত্রে কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয়, শিশু নিজেই সাব্যস্ত করিয়া লয়, বাহির হইতে বিধি-নিষেধ আসিবার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ তাহার অধিশাস্তা তাহার অহম্‌কে বলিয়া দেয়। তাহার কোন আদেশ অমান্য করিলে অধিশাস্তা অহম্‌কে যথেষ্ট শাস্তি দেয়। অনুতাপ উদ্বেগ প্রভৃতি এই শাস্তিরই প্রকারভেদ।

তাহা হইলে দেখা গেল, তিনটি জিনিসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অহম্‌কে চলিতে হয়। বহির্জগৎ, অদস্ এবং অধিশাস্তা। সকলের দাবি যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়া চলিতে পারিলেই অহমের কার্য্য সন্তোষজনক হয়। নতুবা সামান্য খামখেয়ালী ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুতর মানসিক ব্যাধি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। যে ভাবে অধিশাস্তা

গঠিত হয়, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, উহার প্রকৃতি পিতামাতার আদর্শের দ্বারাই নিরূপিত হইয়া থাকে। শুধু তাহা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তির উপর মানুষ শৈশবে নির্ভরশীল থাকে, তাঁহাদের মনের গতি, চিন্তাধারা, যে দেশে, যে সমাজে তাহার জন্ম, সেই দেশের, সেই সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য (traditions) প্রভৃতি দ্বারাই অধিশাস্তার প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয়। অধিশাস্তার মধ্যে তাই, অদসের মতই, অতীত ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অহমের রূপ কিন্তু প্রধানত তাহার নিজের অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে।

অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তার (যথাক্রমে Id, Ego এবং Super-ego) পরিচয় মোটামুটিভাবে কিছু দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে অদস্ই যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা অন্যায় হইবে না। অদস্ কত প্রকারে নিজের শক্তি প্রকাশ করে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার জন্য মনোবিদ্‌গণ সহজাত প্রবৃত্তিগুলির নানারূপ প্রকারভেদের কল্পনা করিয়াছেন, যেমন খাদ্যপ্রবৃত্তি (Food instinct), যৌনপ্রবৃত্তি (Sex instinct) প্রভৃতি। জন্মাইবার পরই জন্তুরা খাদ্যের অন্বেষণ করে, স্তন পান করে, উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সঙ্গম করে, এই সমস্ত কার্য্য তাহাদের শিখাইয়া দিতে হয় না। এই ধরনের কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের আছে, মনোবিদ্‌দের মধ্যে সে বিষয়ে মতের ঐক্য নাই। যতগুলিই হউক, ফ্রয়েডের মতে সমস্তগুলিকেই মূলত দুইটি শ্রেণীর ভিতর আনা যায়। আমাদের কার্য্যাবলীর ফলাফল দুই রকমের হইতে পারে, হয় তাহাদের দ্বারা নিজের সহিত অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির কিংবা বস্তু ও ব্যক্তিদিগের পরস্পরের মধ্যে নূতন বন্ধনের সৃষ্টি

হয়, অথবা যে বন্ধন পূর্ব্বে ছিল তাহা ছিন্ন হইয়া বস্তু বা ব্যক্তি পুনরায় অসংবদ্ধ যোগাযোগহীন অবস্থায় ফিরিয়া যায়। বন্ধন স্থাপন করার প্রবৃত্তি এবং বন্ধন ছিন্ন করার প্রবৃত্তি—এই দুইটি মূল প্রবৃত্তির কল্পনা করিয়া লইলে ফ্রয়েডের মতে মানসিক জীবনের সমস্ত ঘটনাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বন্ধন-স্থাপনের প্রবৃত্তি হইতে আসে—পরকে আপন করিবার চেষ্টা, ঐক্য-স্থাপনের প্রয়াস, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে এক বিরাট গণ্ডির মধ্যে আনিবার উদ্যম। প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে আমাদের এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা অহরহ করিতেছি। পাঁচজনের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, পরকে ভালবাসিয়া, সাহিত্যের ভিতর দিয়া, দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আরও কত উপায়ে অন্যের সহিত অনবরত যোগ স্থাপন করিতেছি। ফ্রয়েড এই বন্ধন-স্থাপনের প্রবৃত্তির নাম দিয়াছেন—এরস—(Eros, গ্রীকদিগের ভালবাসার দেবতার নাম)। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক জীবনেও তেমনই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর অনুষ্ঠানগুলিকেও একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করি। এখন শুধু সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য আমাদের লক্ষ্য। জাতিসমূহের সংঘ (League of Nations) বিশ্বপ্রেম প্রভৃতির কল্পনা এরসের প্রেরণা হইতেই আসে।

এরসের ঠিক বিপরীত ফলপ্রসূ আর একটি যে প্রবৃত্তির উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি—বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তি, ফ্রয়েড তাহাকে আক্রমণ-প্রবৃত্তি (aggressive instinct) এই আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রবৃত্তি হইতে আসে ধ্বংস করার আবেগ, বন্ধন ছিন্ন করিয়া একত্ব নষ্ট করার প্রয়াস। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাঁহাকে অনুরোধ করি পশ্চিমে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে।

আমাদের জাতীয় জীবনের গতি লক্ষ্য করিলেও এই প্রবৃত্তির যথেষ্ট মূর্ত্ত পরিচয় পাইবেন। তথাপি মনে হইতে পারে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে আক্রমণ-প্রবৃত্তির সাক্ষাৎকার মিলিলেও ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো ইহার সাক্ষাৎ না মিলিতেও পারে। উত্তরে বলা যায়, ব্যক্তির মধ্যে না থাকিলে সামাজিক জীবনে ইহার বিকাশ সম্ভব হইত না। ব্যক্তির সমষ্টি লইয়াই তো সমাজ। উপরন্তু নিজেদের কার্য্যকলাপগুলি একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলেই সন্দেহ আপনা-আপনি ভঞ্জন হইয়া যাইবে। সেদিন যে পাকড়াশী চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ফণীর নাকে ঘুষি মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই কার্য্যটির প্রেরণা কোন্ প্রবৃত্তি হইতে আসিয়াছিল? চিঠিখানির পরিণাম কি হইয়াছিল? হিংসা-দ্বেষের বশীভূত হইয়া অপরের ক্ষতি করার দৃষ্টান্ত কি এতই বিরল? শিশুও নবজাত ভাইটিকে সুবিধা পাইলেই চিমটি কাটিয়া বা তাহার হাত পা টানিয়া কিংবা চোখে আঙুল দিয়া কাঁদায়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ধ্বংসবাদীদের মনের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে আক্রমণ-প্রবৃত্তির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, কোন একটি প্রচণ্ড রকমের কার্য্যের ভিতর দিয়াই যে সব সময়ের এই প্রবৃত্তির প্রকাশ হইতে হইবে এরূপ নহে, বহু আপাত-নির্দ্দোষ কথাবার্ত্তায়, যেমন ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রভৃতির ভিতর দিয়াও ইহার সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে প্রাণহীন অচেতন পদার্থ হইতেই সচেতন প্রাণবান পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রাণবান সক্রিয় পদার্থকে পুনরায় নিষ্ক্রিয় প্রাণহীন অবস্থায় লইয়া যাওয়া আক্রমণ-প্রবৃত্তির কাজ, সেইজন্য ইহার আর একটি নাম দেওয়া হইয়াছে—মরণ-প্রবৃত্তি (death instinct)।

দুইটি প্রবৃত্তির লক্ষ্য এবং কার্য্যধারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরবিরোধী

হইলেও ইহারা সব সময়েই যে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহা নহে, মিলিয়া মিশিয়াও চলিয়া থাকে। যেমন মনে করুন, 'খাওয়া' কাজটিতে একটি দ্রব্যের (খাদ্যের) ধ্বংস হইতেছে বটে, কিন্তু শরীরের সহিত তাহার যোগাযোগ স্থাপিত হইতেছে। সেইরূপ স্বরতক্রিয়া এক প্রকার আক্রমণ বটে, কিন্তু তাহার সাহায্যেই নিবিড় মিলন সংঘটিত হয়। এই দুইটি প্রবৃত্তির মিলন-বিরোধই আমাদের জীবনের সকল প্রকার বৈচিত্র্যময় লীলার আদি উৎস।

এরসের শক্তির ফ্রয়েড নামকরণ করিয়াছেন—কামশক্তি (libido)। আক্রমণ-প্রবৃত্তির শক্তির ওইরূপ উপযুক্ত নাম কিছু নাই। উভয় শক্তিই প্রথমে অদসের ভিতর অবস্থিত থাকে। অধিশাস্তা যখন রূপ ধরিতে আরম্ভ করে, আক্রমণ-প্রবৃত্তির বহু পরিমাণ শক্তি তখন অহমের ভিতর আসিয়া পড়ে। ধ্বংস করা ইহার কাজ, সুতরাং সধর্ম্ম অনুসারে ইহা অহম্‌কে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। নিজের মাথার চুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, নিজের গালে চড় মারিতেছে, এরূপ ব্যাপার মানসিক রোগীদিগের মধ্যে তো যথেষ্টই দেখা যায়, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ইহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টাও অহমের আছে, তাই অধিক পরিমাণে আক্রমণ-শক্তি আপনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হইলে অহম্ তাহাকে বহির্মুখী করিয়া দেয়। তখন রাগান্বিত হইলে আমরা দ্রব্যাদি ছুঁড়িয়া ফেলি, এটা ভাঙি, ওটা নষ্ট করি, অথবা শিশুপুত্রকে অযথা প্রহার করিয়া বসি। প্রধানত বহির্মুখী হইলেও এই শক্তির কিয়ৎ পরিমাণ কিন্তু চিরকালের জন্য অহমের ভিতর থাকিয়া যায়। নানাবিধ ব্যাধিজনিত কষ্টভোগ তাহার প্রমাণ। মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া সকল অহম্‌কেই একদিন এই শক্তির নিকট শেষ পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

কামশক্তিও অদস্ হইতে আসিয়া প্রথমে অহম্‌কে ব্যাপিয়াই থাকে। সেই অবস্থায় শিশু শুধু নিজেকেই ভালবাসে, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর নার্‌সিসাসের গল্প আপনারা সকলেই জানেন, নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেই বিভোর। অহমের মধ্যে কামশক্তির অধিষ্ঠানের ফল ওই ধরনেরই হইয়া থাকে, অহম্ আপনাকেই ভালবাসে, আপনাতেই আপনি বিভোর হইয়া থাকে, তাই ফ্রয়েড এই অবস্থার নাম দিয়াছেন—স্বকাম (narcissism)। ক্রমে বহির্জগতের অন্যান্য বস্তুর উপর কামশক্তি আরোপিত হইতে থাকে, তখন অহমের আদি স্বকামের (primary narcissism) অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। কামশক্তি গতিশীল, এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে চলাচল করা ইহার একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আক্রমণ-প্রবৃত্তির শক্তির ন্যায় কিয়ৎপরিমাণ কামশক্তিও চিরকাল অহমের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যদি কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতে পারে, তবেই কামশক্তির সমস্তটিই অহম্ ছাড়িয়া ভালবাসার বস্তুর উপর যাইতে পারে।

শরীরের সহিত কামশক্তির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মোটামুটিভাবে সমস্ত শরীরটিকেই কামশক্তির উৎস বলিয়া ধরা যাইলেও কয়েকটি অঙ্গের সহিত ইহা বিশেষভাবে বিজড়িত, যেমন—ওষ্ঠ, ঊরু, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি। এই অঙ্গগুলিকে তাই কামস্থান (erotogenic zones) বলা হয়। পর্য্যবেক্ষণের ফলে সমীক্ষকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কামবাসনা (sexual desire) ও তজ্জনিত ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়াই কামশক্তির (libido) সমধিক ও সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়। সেইজন্যই মানবজীবনে কাম বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি, তাহার এত প্রতাপ। এই প্রতাপ লক্ষ্য করিয়াই

ফ্রয়েড মানুষের কামজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর বিশেষভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন এবং সকলের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অনুসন্ধানের ফলে কামজীবন সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা ফ্রয়েড জানিতে পারিলেন। বার বার পরীক্ষার দ্বারা নূতন তথ্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যখন আর কোন সংশয় রহিল না, তখন তিনি সেগুলি প্রচার করিলেন। প্রচার করিবামাত্র কিন্তু সমাজের মধ্যে ঘোরতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তথ্যগুলি এতই অভিনব এবং আবহমান-কাল-প্রচলিত ধারণাসমূহের এতই বিরোধী যে, কেহই সেগুলি সহ্য করিতে পারিল না। নীতিবাদী এবং সমাজনেতাদের মনে বিশেষ বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যেও কেহই বৈজ্ঞানিকভাবে তথ্যগুলি পরীক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না; সকলের সহিত একমত হইয়া তাঁহারাও তথ্যগুলিকে নাকচ করিয়া দিলেন এবং ফ্রয়েডকে কার্য্যত বিদ্বদ্‌সমাজে 'একঘরে' করিলেন। ফ্রয়েড আজ বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষভাব এখনও যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু কেন এই বিদ্বেষ? তথ্যগুলির নূতনত্বই কি শুধু ইহার কারণ? অনেকেই তো অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সকল আবিষ্কারকই তো বিদ্বেষের পাত্র হইয়া উঠেন নাই। নিউটন, আইন্‌স্টাইনকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ৺জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, ভেঙ্কাটারমন প্রভৃতিকে তাঁহাদের আবিষ্কারের জন্য কোথাও তো লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই, বরং সকলেই তাঁহাদের সম্মান প্রদান করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব। তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হইবে না যে, ফ্রয়েডের প্রতি বিদ্বেষের মূলে অন্য কোন নিগূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। কি সে কারণ?

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি কোন প্রকারে আমার আত্মগরিমায় আঘাত দেয়, সেই ব্যক্তিই আমার বিদ্বেষের পাত্র হয়। যেটি আমার প্রধান গর্ব্বের বিষয়, সেই সম্বন্ধে কেহ কোন রকমে আভাসে ইঙ্গিতে, কথায় ব্যবহারে আমায় হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে আমি প্রথমেই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি, এবং সে আমার বিরাগভাজন হইয়া পড়ে। এইরূপই একটি ব্যাপার ফ্রয়েডের আবিষ্কার-ফলে ঘটিয়াছিল। তাঁহার নূতন তথ্যগুলি আইন্‌স্টাইন প্রভৃতির তথ্যের ন্যায় শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকেই নাড়া দেয় নাই, তাহারা আমাদের গর্ব্বে আঘাত দিয়াছিল। তাই ফ্রয়েডের প্রতি এত বিদ্বেষ।

আমাদের গর্ব্ব, আমরা সভ্য, আমরা সংস্কৃতিসম্পন্ন। পৃথিবীর আদিকালের অসভ্য জাতির লোকের অপেক্ষা আমাদের মন নীতি বুদ্ধি প্রভৃতি সব দিক দিয়াই অত্যন্ত উন্নত। অন্যান্য পরিচয়ের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির একটি পরিচয় এই যে, আমরা সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে, বিশেষত কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়াছি, সভ্যসমাজে তাহাদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা পর্য্যন্ত দোষ বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। নির্ম্মলচিত্ত শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করি, যাহাতে যৌবনে তাহার মনে কামবাসনার প্রথম উন্মেষের সময়েই সে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং তাহার মন আমাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়। অন্যান্য প্রবৃত্তিও তাহাকে দমন করিতে শিখাই, কিন্তু কাম সম্বন্ধেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি; কারণ কামপ্রবৃত্তিই সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, সংস্কৃতি বজায় রাখিতে হইলে উহার নিগ্রহই বিশেষ প্রয়োজন।

যে হীন প্রবৃত্তিকে বিতাড়িত করিতে পারিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি, ফ্রয়েড সেই কামপ্রবৃত্তিকেই আবার সভ্যসমাজের আলোচনার

কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসিলেন। শুধু তাহাই নহে, বিতাড়িত করা দূরে থাকুক, বহু ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কার্য্য যে আমরা ওই প্রবৃত্তির প্ররোচনাতেই করিতেছি, তাহা দেখাইয়া দিলেন। উপরন্তু শিশুকে যেরূপ নির্ম্মলচিত্ত, নির্দ্দোষ, কামবাসনাহীন মনে করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকি, শিশু যে তাহা নহে, উদাহরণের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইলেন। আমাদের গর্ব্বে আঘাত লাগিল, আমরা ক্রুদ্ধ হইলাম, ফ্রয়েডের শাস্তির ব্যবস্থা করিলাম। ব্যাপার হইতেছে এই, আমাদের সংস্কৃতি যে স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহার বহু পরিমাণই যে কৃত্রিম এবং ইহার মূলে যে কামসম্বন্ধীয় একটি দৌর্ব্বল্য আছে, এ ভয় আমাদের মনের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। আত্মপ্রবঞ্চনার শরণ লইয়া উটপক্ষীর মত বালুরাশির মধ্যে মুখ লুকাইয়া আমরা বেশ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলাম। ফ্রয়েড সেই সুখ নষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি ভুল বলিতেছেন ধরিয়া লওয়া ভিন্ন নিজের সুখ বজায় রাখিবার আর কি প্রকৃষ্ট উপায় হইতে পারে?

প্রবৃত্তিমাত্রেরই লক্ষ্য নিজেকে চরিতার্থ করিয়া আনন্দ উপভোগ করা। কামপ্রবৃত্তির লক্ষ্যও তাহাই, কিন্তু এখানে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, কাম বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি, libido শব্দটি তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফ্রয়েড বলেন, আমরা কাম শব্দটির অর্থ অন্যায়ভাবে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছি। সুরতক্রিয়াকেই আমরা কামবাসনা চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি। এ ধারণা কিন্তু সঙ্গত নয়। এমন অনেক বৈকৃতকাম ব্যক্তি (perverts) আছেন, যাঁহারা সুরতক্রিয়ার সাহায্য না লইয়া অস্বাভাবিক উপায়ে তাঁহাদের বাসনার তৃপ্তিসাধন করেন।

সমলিঙ্গকামীরা (homosexuals) অসমলিঙ্গ ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস সহ্য করিতে পারে না। তাই বলিয়া তাহাদের বাসনা কি কামবাসনা নয়? অন্য দিকে আবার দেখা যায়, জনেনন্দ্রিয় ভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও (পূর্ব্বে যাহাদের কামস্থান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে) কামবাসনা চরিতার্থ করিবার সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রেও বহুপ্রকারের বিকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন বস্তুকামী (fetichists), দর্শনকামী (peepers voyeurs) প্রভৃতি। এক ব্যক্তি সর্ব্বদা একখানি কাঁচি লইয়া বেড়াইত এবং সুবিধা পাইলেই স্ত্রীলোকের মাথার চুল কাটিয়া লইত। তাহাতেই তাহার চরম সুখভোগ হইত; স্ত্রীসঙ্গম কখনও সে করে নাই। এই জাতীয় ব্যক্তিদিগের বাসনা কি কামবাসনা বলিয়া বর্ণিত হইবে না? অতএব দেখা যাইতেছে, কামবাসনার সহিত জননেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইলেও একেবারে অচ্ছেদ্য নয়। ফ্রয়েডের মতে কামবাসনা প্রথমত নানা ভাবে নানা অঙ্গে ছড়াইয়া থাকে। শিশুমনের পরিণতি যথাযথভাবে হইয়া আসিলে ক্রমশ জননেন্দ্রিয়ই এই বাসনার প্রধান বাহক হইয়া উঠে। যথাযথোভাবে না হইলে কোন না কোন প্রকার বিকৃতির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। মুখই প্রথম আনন্দ-প্রদানের অঙ্গ। স্তন্যপানে তৃপ্তিলাভ করিয়া শিশু আনন্দ উপভোগ করে। শীঘ্রই কিন্তু স্তন্যপানের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও শুধু আনন্দ লাভের জন্যই শিশু মাতৃস্তন চুষিয়া থাকে। এই সময়ে সে সকল দ্রব্যই মুখে দিবার চেষ্টা করে। পরিণতির এই অবস্থাকে ফ্রয়েড 'মুখকাম' অবস্থা (oral phase) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরও একটি অবস্থা—যাহাকে 'পায়ুকাম' অবস্থা (anal phase) বলা হয়—অতিক্রম করিয়া কৌশোরে শিশু 'লিঙ্গকাম' অবস্থায় (genital phase) আসিয়া পৌঁছায়। এই সময় হইতেই জননেন্দ্রিয় কামজীবনে প্রাধান্য লাভ করে।

আর এক দিক হইতে বিবেচনা করা যাউক। মাতার নিকট হইতেই শিশু তাহার প্রথম আনন্দ-উপভোগের উপকরণ প্রাপ্ত হয়, তিনিই তাহার প্রথম বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তিনিই তাই শিশুর প্রথম ভালবাসার পাত্র হন। অহম্ হইতে কামশক্তি তাঁহার দিকেই সর্ব্বপ্রথম চালিত হয়। মাতার নিকট হইতে আনন্দ পাইবার পথে ক্রমশ বাধা আসিতে থাকে, পিতা প্রধান অন্তরায় হন। তখন পিতার অভিমুখে আক্রমণশক্তি পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। এই যে অবস্থা—মাতার প্রতি আকর্ষণ এবং পিতার প্রতি বিদ্বেষ—ফ্রয়েড ইহাকে ঈডিপাস অবস্থা (Œdipus situation) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (গ্রীকদিগের পুরাতত্ত্বে ঈডিপাসের একটি গল্প আছে। তিনি একবার না জানিয়া মাতৃগমন করিয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পারেন, তখন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি তাঁহার চক্ষুদ্বয় উপড়াইয়া ফেলেন।) এই অবস্থা হইতে অনেক স্তর পার হইয়া অবশেষে শিশু কৈশোরে উপনীত হয়। কৈশোরপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই যে সমস্ত অভিজ্ঞতা শিশু অর্জ্জন করে, তাহা হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হয়।

মনের গঠন ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সমীক্ষকেরা যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। পরিণতির সকল অবস্থার ও স্তরের বিস্তৃত বর্ণনা করা এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে এবং আমার উদ্দেশ্যও নহে। মনঃসমীক্ষণের শুধু কয়েকটি মূল কথার অবতারণা করিয়া আপনাদের দৃষ্টি যাহাতে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য, সাধ্যমত তাহাই করিলাম। জটিলতর সমস্ত সমস্যাই তাই বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে রহিল।

বর্ণনা মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আর একটি বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। মনের সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান—এই তিনটি স্তরের কল্পনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। অধুনা অদস্, অহম্ প্রভৃতির কথা বলিলাম। এখন পূর্ব্ববর্ণিত স্তরগুলির সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিরূপ দেখা যাউক। সংজ্ঞান যে অহমেরই গুণ, এ কথা না বলিলেও চলে। বিবিধ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বহির্জগতের বস্তুসমূহের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (perception) আমাদের হয়, তাহা সংজ্ঞানেরই বিষয়। সংজ্ঞানকে তাই মনঃসমীক্ষকেরা অহমের একেবারে বহির্তম প্রদেশে, বহির্জগতের সন্নিকটেই অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু বহির্জগতের বস্তু ভিন্ন অন্য বিষয়ও আমাদের সংজ্ঞানে আসিতে পারে। পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার স্মৃতি, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহার কল্পনা, এ সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হইতে পারি। সুতরাং সংজ্ঞানের বিষয়বস্তু শুধু বাহির হইতেই আসে না। অহমের ভিতর হইতেও আসে। যেখান হইতে আসে, তাহাকে আমরা আসংজ্ঞানের স্তর বলিয়াছি। এই আসংজ্ঞানের স্তর কেবলমাত্র অহমেরই বিশেষ গুণ, অহমেতেই ইহা বিদ্যমান, অন্য কোথাও নাই। আসংজ্ঞান যেমন অহমের, নির্জ্ঞান তেমনই অদসের নিজস্ব গুণ। অদসের ভিতর যাহা কিছু আছে, সবই আমাদের চেতনার বাহিরে। প্রথমে শুধু অদস্ই ছিল। বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার এক অংশ ক্রমে অহমে পরিণত হয়। অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়, সেই অজ্ঞাত অংশই নির্জ্ঞান। অহম্ বহির্জগৎ এবং অদস্ হইতে যাহা পায়, নানা কারণে সবই ধরিয়া রাখিতে পারে না, বাধ্য হইয়া বহু বিষয় অদসের ভিতর পাঠাইয়া দেয়। অহম্ হইতে ফিরিয়া অদসে যাহা যায়, তাহাকে আমরা পূর্ব্বে অবদমিত (repressed) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং অদসের ভিতর দুই জাতীয়

সরঞ্জাম আছে, সহজাত অপরিবর্ত্তিত আদি সরঞ্জাম এবং অহম্ কর্ত্তৃক অর্পিত অবদমিত সরঞ্জাম।

পরিশেষে একটি সতর্কবাণীর উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে ভাবে স্তর, অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে ধারণা হইতে পারে যে, মন যেন বিস্তৃতি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন একটি দ্রব্যবিশেষ। মনঃসমীক্ষকেরা মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আদৌ ওইরূপ ধারণা পোষণ করেন না। মানসিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা, পরস্পরের সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপার বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করে বলিয়াই ঐরূপ কল্পনাসমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন, পদার্থবিদ্‌রা যেমন বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার একটি বিরাট শক্তির (energy) খেলা বলিয়া ধরিয়া লন, মনটিকেও সেইরূপ একটি বিশেষ শক্তির আধার এবং মানসিক ঘটনাবলী সেই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মনে করিয়া লইলে নব-আবিষ্কৃত তথ্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করা আরও সহজ হইবে। মনের যে একটি অন্তর্নিহিত গতির আবেগ আছে, অর্থাৎ মন যে গত্যাত্মক (dynamic) তাহা আমরা সকলেই অনুভব করি, সেই হিসাবে মনকে শক্তির আধার বলিয়া কল্পনা করিলে অসঙ্গত হয় না। সেই শক্তির প্রকৃত রূপ কি, তাহা আমরা জানি না। পদার্থবিদ্‌রাও তো তাঁহাদের কল্পিত আদি শক্তির স্বরূপের বিষয় অবগত নন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ব্যাখ্যা অর্থহীন বা তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ, এ কথা কেহ মনে করিতে পারেন না। মনঃসমীক্ষকদিগের সমস্ত ব্যাখ্যার মূলে বাস্তবিকই এই শক্তির কল্পনা বিদ্যমান আছে। সেই কল্পিত শক্তির স্বরূপ জানা নাই—শুধু এই অজুহাতেই ব্যাখ্যাগুলির কোন দাম নাই মনে করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। তবে শুধু তর্কের খাতিরে ফ্রয়েডের কোন তথ্যই কাহাকেও মানিয়া লইতে আমি বলি না, মানিয়া লওয়া উচিতও নয়। কিন্তু এ বিশ্বাস আমার যথেষ্টই আছে,

একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজেদের কার্য্যাবলী, অনুভূতি, ইচ্ছা, বিক্ষোভ প্রভৃতি বিধিমতভাবে অর্থাৎ নিজের অহম্‌কে যতদূর সম্ভব স্বকাম হইতে মুক্ত করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তথ্যগুলির সত্যতা স্বতই প্রতীয়মান হইবে। বিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে এ কথা স্বীকার করিতেই হয়, মানসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করিবার যত তথ্য এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে, ফ্রয়েডের তথ্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও কার্য্যকরী এবং সেইজন্য সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। আজ না হইলেও ফ্রয়েড-আবিষ্কৃত নির্জ্ঞান তথ্য যে অচিরভবিষ্যতে বিবর্ত্তনবাদের ন্যায়ই বিজ্ঞান-জগতে সর্ব্ববাদিসম্মত এবং সভ্যসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই।

বিজ্ঞান ও শিক্ষা

আমাদের দেশে বিদ্বৎসমাজে বিজ্ঞান শিক্ষার যেরূপ আদর আছে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের সেরূপ নাই। বাস্তব জগতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলে স্বীকার করেন বটে, কিন্তু দৈনিক জীবনে শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপকারিতা অনেকেই অনুভব করেন না। বিজ্ঞান, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে একটি বিশেষ স্তর অধিকার করে, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইবে না। কিন্তু শিক্ষা যে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের মধ্যে স্থান পাইতে পারে, সে ধারণা করিতে অধিকাংশ লোকেই কুণ্ঠিত হইবেন।

এই কুণ্ঠার কারণ কি? আমার মনে হয়, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান—এই উভয় বিষয় সম্বন্ধেই কতক অসম্পূর্ণ ও কতক ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এই কুণ্ঠার উদ্রেক হয়। বিজ্ঞান বলিলেই আমাদের মনে Physics, Chemistry, Botany, Laboratory, এই সকলেরই একটি ছায়ার উদয় হয়। সুতরাং তাহার মধ্যে শিক্ষা-সমস্যার কোন যোগাযোগ দেখিতে পাই না। অপর দিকে, শিক্ষা অর্থে নানা লোক নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকেন এবং সেই সকল কল্পনার মধ্যে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক। তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ আলোচনাই হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, এই বিষয়ে। এই ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মীমাংসা নির্ভর করে আবার আরও একটি বৃহত্তর প্রশ্নের উপরে,—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই শেষ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দেয় না, দেয় দর্শন। অতএব, শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা বিজ্ঞানের নয়, দর্শন-শাস্ত্রেরই অন্তর্গত হওয়া উচিত—ইহাই সাধারণের কথা।

সাধারণের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, ইহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে যে উপনীত হওয়া যায় না, তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানাবিধ জটিল প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হয়। এই সমস্ত প্রশ্ন লইয়া আজকাল আমাদের দেশে একটি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, সকল বিষয়েই আমূল পরিবর্ত্তন, সমূল উৎপাটন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে। এই সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে হইলে যে পন্থা আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা সহায়ক হইতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহারই একটি ইঙ্গিত দিতে প্রয়াস পাইব।

দেখা যাউক, বিজ্ঞানের বিশেষত্ব কি। Physics, Chemistry প্রভৃতি যে বিজ্ঞান, সে সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যদি শুধু ঐগুলিকেই বিজ্ঞান বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা করা হয়। আমরা সচরাচর এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণাই পোষণ করি। তাহার কারণ বোধ হয়, শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা। বিশ্ববিদ্যালয় Science Course-এর জন্য যে সকল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেইগুলিই বিজ্ঞান, এবং যেগুলি Arts Course-এর জন্য বলিয়া দিয়াছেন, সেইগুলিই Arts, এইরূপ বিশ্বাস করি। কিন্তু সামান্য বিচার করিলেই দেখা যাইবে, এই মাপকাঠির দ্বারা বিষয়ের শ্রেণীভাগ করা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, ন্যায়শাস্ত্র-বহির্ভূতও বটে। সুতরাং, ব্যবহারিক জীবনে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেও, বিজ্ঞানের বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও অগ্রসর হইতে হইবে এবং অন্য মানদণ্ডের সাহায্য লইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কেনই বা কতকগুলি বিষয়কে বিজ্ঞান বলেন, এবং অন্যগুলিকে অন্যরূপ ছাপ মারিয়া দেন ?

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে দৈনিক জীবনে যে সমস্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসি, তাহাদের স্বরূপ এবং পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা সকলকেই করিয়া লইতে হয়। এই ধারণাসমূহ যে আমরা সব সময়েই জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক গড়িয়া লই, তাহা নহে। এমন কি, আমাদের সারা দিনের কাজকর্ম্মের পশ্চাতে যে এইরূপ কোন ধারণা আছে, তাহাও আমরা অনেক সময়ে উপলব্ধিই করি না, সকল সময়ে ভাবিয়াও দেখি না, এবং দেখিবার প্রয়োজনও হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই চালিত হই। হাক্সলি বলিয়াছেন—"Science is perfected common sense", অর্থাৎ এই সাধারণ বুদ্ধির চরম উৎকর্ষই বিজ্ঞান। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে, কিংবা একই বস্তু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ধারণা পোষণ করি, তাহার মধ্যে অনেক বিরোধ বা বৈষম্য থাকিয়া যায়। এই সমস্ত বৈষম্য দূর হইয়া সাধারণ বুদ্ধি যখন পূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, তখনই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। মোটামুটিভাবে এই কথা মানিয়া লইয়া আরও একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিজ্ঞান সৃষ্টির দুইটি উপকরণ —বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের বস্তু।

প্রথম বৈজ্ঞানিকের দিক হইতে দেখা যাক। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সহিত প্রাকৃতজনের যখন তুলনা করি, তখন দেখিতে পাই, বৈজ্ঞানিকের প্রথম বিশেষত্ব হইতেছে—তাঁহার অনুসন্ধিৎসা। যে কোন বিষয়ে যতটুকু জ্ঞানলাভ করিলে দৈনিক জীবন অনায়াসে অতিবাহিত করা যায়, প্রাকৃতজন তাহার অধিক জানিবার চেষ্টা করেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তীব্র অনুসন্ধিৎসার তাড়নায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুর কার্য্যকারণ সম্পর্ক, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি, বিকার, লয় প্রভৃতির

্যায়সঙ্গত তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত ন না। এইখানে আবার আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির লোভে প্রণোদিত হইয়া বৈজ্ঞানিক াহার অনুসন্ধানে রত হন না, বস্তুকে নিষ্কামভাবে শুধু তাহার বস্তুত্ব হিসাবে দেখাই তাঁহার স্বভাব। বস্তু, তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি অথবা আত্মসুখ রিতার্থতার উপকরণ হিসাবে তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয় না। ইহাই বজ্ঞানিকের আর একটি বিশেষত্ব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূলে ার্থের সন্ধান যদি থাকিত, তাহা হইলে আজ আমরা বিজ্ঞানের এই বিশ্ববিজয়ী বাণী শুনিতাম না, তাহার এই মহামহিমময় রূপ আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিত না। জেম্‌স তাই বলিয়াছেন,—

"যখনই কেহ পদার্থ-বিজ্ঞানের চমৎকার প্রাসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং উপলব্ধি করেন, কিরূপে উহা গড়িয়া উঠিয়াছে, কত সহস্র নিঃস্বার্থ সাধুজীবনের উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, কত ধৈর্য্য ও ত্যাগ, কত ইচ্ছা দমন, বহির্জগতের ঘটনাবলীর উদাসীন নিয়তির নিকট কত পরাজয় উহার প্রস্তরে প্রস্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, কিরূপ সম্পূর্ণ অব্যক্তিকরূপে আপন মহান মহিমায় ইহা উজ্জ্বল, তখন স্বেচ্ছায় ধূম্রমণ্ডলীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া আপনার ব্যক্তিগত স্বপ্নের দ্বারা চালিত হইয়া ঘটনা-রহস্যের সমাধান করিবার ভান যাঁহারা করেন, সেই ভাবপ্রধান ব্যক্তিগণ কিরূপ প্রমত্ত ও নিন্দার্হ বলিয়া প্রতীয়মান হন!"—*The Will to Believe*, 1897, p. 7.

যখন যে অনুসন্ধানে রত, সেই বিষয়ে এই নিরাসক্তিই বৈজ্ঞানিকের বিশেষ গুণ। কিন্তু নিরাসক্তভাবে অনুসন্ধান করেন বলিয়া যে সেই বিষয়ের প্রতি বৈজ্ঞানিকের প্রাণের কোন যোগ নাই, তাহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। বরং ইহার বিপরীত কথাটাই সত্য। তিনি এই আকর্ষণ

এত বেশি অনুভব করেন যে, বস্তুর সহিত আপনাকে এক করিয়া দিতে চাহেন। বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তিনি তাহার অন্তস্ত পৌঁছাইতে চাহেন, তাহার স্বরূপ দেখিতে চাহেন, যে কে বৈজ্ঞানিকের জীবনী পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহার সাফলে ভিত্তি এই দুইটি চিত্তবৃত্তি। আমার মনে হয়, এই অনুসন্ধিৎসা এবং অনুসন্ধানে স্বার্থহীন আত্মদান ডারুউইনের জীবনে এরূপভাবে পরিস্ফু হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাকেই বৈজ্ঞানিকের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লও যাইতে পারে।

এইবার দেখা যাক, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের বিষয় কি? কথায় বলা যায়, 'facts' বা ঘটনাবস্তু। যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব বা সকল ঘটনা আমরা অনবরতই মানিয়া লইতেছি, যাহাদের বিষয় অনে সময় কোন জিজ্ঞাস্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, তাহ বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। কিন্তু 'facts' শূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায় না যতক্ষণ না কেহ সেই ঘটনাবস্তু অনুভব করিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছে ততক্ষণ fact-এর অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং অনুভূতির বিষয়সমূহ বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের বস্তু। শুধু বিজ্ঞান কেন, সাহিত্য বলু দর্শন বলুন, সকলের উৎপত্তিই ওই বিষয়ানুভূতি হইতে। তবে তাহাদে প্রভেদ কোথায়?

প্রভেদ তাহাদের outlook অর্থাৎ লক্ষ্যে এবং উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞা বাস্তব জগৎ লইয়া কার্য্য করে। বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে উদ্দেশ্য, মূল্য, সামাজিক উপকারিতার কোন কথা নাই। বস্তুকে বিজ্ঞান শুধু তাহার বস্তুত্ব হিসাবেই অনুসন্ধান করে। পৃথিবীতে তাহার দাম কি, সমাজে তাহার প্রয়োজনীয়তা কি, সে সমস্ত নিরূপণ করা বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

"বৈজ্ঞানিকের বাস্তব অবস্থিতির উপর স্বাভাবিক আসক্তি প্রকাশিত হয়, যখন ব্যবহার ও উদ্দেশ্য, সুশৃঙ্খল সার্থকতা, সৌন্দর্য্য, সামাজিক উপকারিতা, ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ইত্যাদির অপসারণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর অনাড়ম্বর 'কেন'তেই স্পষ্টত সাড়া দেন, আরও অধিক মনোযোগ বা গুণগ্রহণের দাবি করিলে তিনি অস্বীকার-সূচক সাড়া দিয়া থাকেন।"—Titchener: *Systematic Psychology*, 1929, pp. 32-33.

তাই বিজ্ঞানের কার্য্যপ্রণালী শুধু observation বা সমীক্ষা। অভিনিবেশপূর্ব্বক ধৈর্য্যের সহিত ঘটনাবলীর সমীক্ষণ এবং বর্ণন—ইহাই বৈজ্ঞানিকের কার্য্যধারা। তাই যত অধিক তথ্য অনুসন্ধান করা হইতে থাকে, বিজ্ঞান ততই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিলেই যে অধিকতর গভীরভাবে দার্শনিক হওয়া যায়, তাহা নহে।

একই ঘটনার নানা দিক, তাই নানা বিজ্ঞান। বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে অনেক দিক হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতে হয়। ক্ষুধার সময় খাওয়া একটিই ঘটনা, কিন্তু উহা Physics, Chemistry, Physiology, Psychology সকল শাস্ত্রেরই অধ্যয়নের বিষয় হইতে পারে। তাই যদিও বিষয় হিসাবে আমরা সাধারণত বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করি, মূলত আমাদের attitude অথবা দেখিবার পদ্ধতির উপরেই উহা নির্ভর করে।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আভাস দিয়াছি, এখন দেখা যাক, শিক্ষার সহিত বিজ্ঞানের সংস্পর্শ কোথায়।

আমরা 'শিক্ষা' শব্দটির যথেষ্ট অপব্যবহার করি বলিয়া আমার মনে হয়। সাধারণত 'শিক্ষিত' অর্থে এম. এ., বি. এ. পাস করা, এইরূপ

ধারণা করিয়া লই। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনকেই শিক্ষা বলিয়া মানিয়া লই। আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, বুদ্ধিবৃত্তিও নহে, শুধু স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ আমাদের কাছে 'শিক্ষা' নামে অভিহিত হয়। কারণ এম. এ., বি. এ. পাস করা অনেক সময় শুধু স্মৃতিশক্তির উপরই নির্ভর করে।

ইহার দুইটি কারণ আছে বলিয়া মনে করি। একটি অর্থনৈতিক; কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত লোকে দেখিত, এম. এ., বি. এ. পাস করিলেই অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয়, তাই জীবন-সংগ্রাম যত প্রবল হইতে লাগিল, অন্য মনোবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচর্য্যা করাই বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল। কালক্রমে ইহাই 'শিক্ষা' শব্দের একমাত্র অর্থ হইয়া দাঁড়াইল। এ বিষয়ে আমার বলিবার বিশেষ কিছু নাই। শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ যে অসম্পূর্ণ এবং কার্য্যকরীও নহে, আমরা আবার তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আর একটি কারণ, বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে সাধারণ লোকের একটি উচ্চ ধারণা আছে। সকল মনোবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান সকলেই দিয়া থাকে, এবং তাহারা বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধিবৃত্তি মাজ্জিত হইলে অন্য সকল বিষয়েও আশানুরূপ ও সন্তোষজনক ফল লাভ হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি মানবতার ভিত্তি; তাই এই বৃত্তির উৎকর্ষসাধনই শিক্ষার মন্ত্র। সেইজন্য এই অর্থে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির যখন চরিত্রগত অন্য কোনরূপ দোষ বা ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, লোকে আশ্চর্য্য হয়, বলে, "লোকটা লেখাপড়া শিখেও মানুষ হ'ল না।"

'লেখাপড়া শেখার' ক্ষমতার উপর এই যে প্রগাঢ় বিশ্বাস, ইহা শুধু অহেতুক নহে, অতিশয় অতিরঞ্জিত এবং একেবারে অবৈজ্ঞানিক। এই ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়াই আধুনিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং সময়ের

অনুপযোগী। সংস্কার যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সকলেই অনুভব করি, কিন্তু কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্থানে স্থানে সংস্কার করিলে জীর্ণ ইমারত কিছুদিন হয়তো দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু তাহার অচিরাৎ পতন অবশ্যম্ভাবী, যদি তাহার ভিত্তি যথোচিতভাবে স্থাপিত না হইয়া থাকে। এইখানে বিজ্ঞানের সহিত শিক্ষার প্রথম সংস্পর্শ আমরা দেখিতে পাই। বিজ্ঞান আমাদের ভিত্তির দুর্ব্বল অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিয়াছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে যে, বুদ্ধিই মানবজীবনের সার নহে; জীবন-সংগ্রামে বুদ্ধি যত প্রয়োজনীয়, কর্ম্ম-প্রবণতা, ভাব-প্রবণতাও ঠিক সেইরূপ প্রয়োজনীয়। এইটি আমাদের এখন বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। যে কোন শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনায় শেষোক্ত দুইটির স্থান নাই, তাহা কখনই ফলবতী হইবে না। শিক্ষার আদর্শ বড় করিয়া দেখিলেই শিক্ষার উন্নতি করা যায় না। আদর্শ দরকার, কিন্তু বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আদর্শ কল্পনা করা কবিত্বের পরিচায়ক হইলেও কার্য্যকারিতার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

শিক্ষাক্ষেত্রের এই বাস্তবতার বিষয়ে বিজ্ঞান আমাদের পদে পদে সাহায্য করিতেছে। ডারুউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্ব শিশুমন অধ্যয়নের গুরুত্বের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়; সুতরাং শুধু স্কুল-কলেজ সংস্কার করিলে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার মতই হয়। বিজ্ঞান আরও বলিতেছে, প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যেই শিশুচরিত্রের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। সুতরাং এই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা সাবধান হওয়া উচিত। তাই শিক্ষক অপেক্ষা পিতামাতার দায়িত্ব যে কত গুরুতর,

তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যে আমরা জানিয়াছি যে, শিশুমাত্রেই কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; সেইগুলি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই দুইটিই শিক্ষার উপকরণ। কিন্তু এই দুইটি সম্বন্ধেই আমাদের উদাসীনতার অভাব নাই। এইখানে শিক্ষা-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে প্রতি বৎসর কত সহস্র শিশুর দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের প্রত্যেক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতেছে; কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ করিবার কল্পনাও যে অধিকাংশ লোকের মনে উদয় হয় না, তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আধুনিক যুবকদের নানারূপ দোষ দেখাইয়া আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিই; কিন্তু যে আবহাওয়ায় তাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা করার কথা মনে করি না।

"Healthy mind in a healthy body" প্রবচন সকলেই জানেন, কিন্তু শরীরের সহিত মনের সংযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ, তাহা Physiologyর প্রতি নূতন আবিষ্কারেই দেখিতে পাইতেছি। সামান্য অস্ত্রোপচারের ফলে, অনেক আপাতজড়বুদ্ধি শিশুর বুদ্ধি স্বাভাবিক শিশুর ন্যায়ই স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে। মূক, বধির, অন্ধ প্রভৃতিদের শিক্ষিত করিবার প্রণালী দেখাইয়া দিয়া বিজ্ঞান যে সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

শিশুবিজ্ঞানের এইরূপ নানা তত্ত্ব নিত্যই আবিষ্কৃত হইতেছে। এই নূতন জ্ঞানের বহুলপ্রচার একান্ত আবশ্যক। বহুলপ্রচার যে হয় না, তাহার কারণ, আমাদের দেশে Education বিষয়টি শুধু Training College-এর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাহার স্থান নাই। মনোবিদ্যা-বিভাগে ইহার তত্ত্বগত চর্চ্চা

ছু হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যবহারিক দিকে তাহা কার্য্যকরী করিবার কানরূপ সুবিধা নাই।

আশা হয়, দেশবাসীর দৃষ্টি শীঘ্রই এই দিকে পড়িবে। তাহার ক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষার ার লইয়া যেরূপভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সুফল লিবারই সম্ভাবনা। আমাদের দেশের বালকবালিকার সহজাত নোবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের শিক্ষকদের নিকট ইতে পাইবার ভরসা আমরা রাখি। কিন্তু তাহা কেবল শিক্ষার কটি দিক। অপর দিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহা আবার শারীরিক মানসিক। এই দুইটি অবস্থা যাহাতে শিশুমনের বিকাশের অনুকূল য়, সে বিষয়েও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাহা পিতামাতা, াত্মীয়স্বজন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তাই আজ আমি তাঁহাদের ই অনুরোধ করিতে চাই যে, তাঁহারা শিশুমনোবিকাশের গতি াধ্যবসায়ের সহিত অনুসন্ধান করুন, এবং আপন আপন গৃহে অনুকূল াবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে যত্নবান হউন।

ত্র, ১৩৩৬

শিক্ষার অন্তরায়

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি। কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিলে সেই বস্তু বা বিষয়টিকে নিজের আয়ত্তে আনা যায় অথবা স্বীয় প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রবাদ সকল সময়ে সত্য বলিয়া মনে হয় না। কোনও ব্যক্তির কোনও কু-অভ্যাস হইয়া থাকিলে, তাহার কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেও, অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা হয়তো জন্মে না। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই জ্ঞান অনুযায়ী কার্য্য করিবার পথে কোনরূপ অন্তরায় বিদ্যমান আছে। এই অন্তরায় অপসারিত করিতে না পারিলে কার্য্য অগ্রসর হইবে না। সুতরাং তখন আমাদের কর্ত্তব্য হইবে, সেই অন্তরায়গুলি কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করা এবং কিরূপে সেগুলি দূরীভূত করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যাপারে এইরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হই নাই। কারণ ওই জ্ঞান ও কার্য্যের মধ্যে বহুবিধ বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শিক্ষা সম্বন্ধে নানা গবেষণা অধুনা সকল দেশেই হইতেছে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। বলিতে কি, মনোবিদ্যার নূতন আবিষ্কারগুলি শিক্ষাজগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের মূলগত ধারণাগুলি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। অন্যান্য

অনেক দেশেই অনুকূল পরিবেষ্টনে শিক্ষাতত্ত্বের নূতন তথ্যগুলি কার্য্যে পরিণত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও তথ্যগুলি মনোবিজ্ঞানের ও ট্রেনিং-কলেজের পাঠঘরের চতুঃসীমানার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বহির্জগতে, বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে, গৃহে বা বিদ্যালয়ে তাহাদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না, তাহার কারণ অবশ্য আছে। নূতন তথ্যের কার্য্যপ্রসূ হইবার পথে আমাদের দেশে অন্তরায় অনেক। সেইগুলির নিরাকরণ করিতে না পারিলে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার সম্ভবপর নহে। নূতন কার্য্যের বাধা-বিঘ্ন সকল দেশেই থাকে। শিক্ষাদান-কার্য্য সফল করিবার চেষ্টায় যে সকল অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতে হয়, সাধারণভাবে তাহাদের আলোচনা করা এবং আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া যে সকল বাধা বিদ্যমান আছে, সেগুলির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

বাধাগুলি নানাভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। কতকগুলি বাধা ব্যক্তিগত, কতক পরিবারগত, কতকগুলি সমাজগত, ইত্যাদি। পৃথকভাবে এইগুলি বিবেচনা করিলে বক্তব্য সহজ হয়, কিন্তু ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এরূপ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ও পরস্পরনির্ভরশীল যে, বিচ্ছিন্ন আলোচনায় কিছু কৃত্রিমতা-দোষ আসিয়া পড়ে। এ দোষ অপরিহার্য্য হইলেও মারাত্মক নহে। সকল শাস্ত্র, সকল বিজ্ঞানকেই এই ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইয়াই প্রথম অগ্রসর হইতে হয়। শেষে সামঞ্জস্য হইয়া যায়। সুতরাং এই অনিবার্য্য সঙ্কীর্ণতার কথা মনে রাখিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরাও পৃথক পৃথক ভাবে অন্তরায়গুলির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমত—ব্যক্তিগত বাধা। যাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার

শারীরিক অবস্থা ও মানসিক গুণাগুণের উপরে যে বাধা নির্ভর করে, তাহাকেই আমি ব্যক্তিগত বাধা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। বর্ত্তমান যুগকে শিশুর যুগ বা the age of the child বলা হয়। শিক্ষা-প্রণালীর ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে এই বর্ণনার যথেষ্ট সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে যে বিষয় শিক্ষণীয় বলিয়া মনে হইত, সকল শিশুকেই সে বিষয়ে পারদর্শী করিবার চেষ্টা করা হইত। শিক্ষার ধারারও কোনরূপ বিভিন্নতা ছিল না, সকলের প্রতি এক নিয়ম প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা ছিল। সকলকেই যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না, বা সকল শিশুর প্রতি যে এক শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যকরী হয় না, শিক্ষকেরা ক্রমে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। তখন হইতে এই ধারণার উৎপত্তি হইল যে, শিশুর শিক্ষার বিষয় ও ক্রমপরিণতি এবং তাহার মনের ক্রমবিকাশ, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অতীব প্রয়োজন, নচেৎ শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু শিশুমন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা তখন হয় নাই। সুতরাং বহু ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া সে যুগের শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতির সহিত এই সকল অপরীক্ষিত ধারণা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে এবং শিক্ষা-প্রণালীও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শিক্ষা-বিষয়টি এখন শিশুমনের নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলির উপর স্থাপিত হইয়া একটি বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য হইয়াছে। শিশুমনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যথেষ্ট হয় বলিয়া এবং শৈশবের শিক্ষার উপরে ব্যক্তিমাত্রেরই চরিত্রের গঠন ও শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, এই সত্য নিঃসংশয়িতভাবে এই যুগে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া এই যুগকে শিশুর যুগ বলা হয়।

মানসিকতার বিকাশের নানা দিক ও স্তর। এক এক দিকে এবং এক এক স্তরে বিশেষ কোনও শিশুর মন কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার পরিমাপ করিবার জন্য বহুবিধ মানদণ্ডের (Mental test) সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল test-প্রয়োগে নির্ণীত হইয়াছে যে, শিক্ষার দ্বারা উন্নতি সকলের সম্ভবপর নয়। মানসিক বয়স হিসাবে কতকগুলি শিশুকে idiot-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠনও প্রায়ই অস্বাভাবিক ধরনের হইয়া থাকে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জীবনরক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মগুলি করিতেও এই শিশুরা শিক্ষা করে না। প্রাণনাশকারী কোন বিপদের সম্মুখীন হইলেও তাহারা নড়িয়া বসিয়া নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। Test-সমূহের সাহায্যে আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, নির্ব্বোধ বলিয়া যে সকল শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ হতাশ হই, তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতারও তারতম্য আছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইবার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। Imbecile এবং feeble minded শিশুদিগের বিশেষ রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহাদের বুদ্ধির কথঞ্চিৎ প্রসার হওয়া খুবই সম্ভব। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, idiot-শ্রেণীভুক্ত হওয়া শিক্ষার একটি ব্যক্তিগত বাধা। কিন্তু idiot-শ্রেণীভুক্ত নয়, অথচ চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না—এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক সময় দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে জানা যাইবে, শিশুর শরীরগত কোনরূপ বাধা আছে। চক্ষু, কর্ণ, টন্‌সিল বা অন্য কোন অঙ্গের দোষ আছে। চিকিৎসা দ্বারা সেই দোষের অপনোদন করিলে সহজ ও সাধারণ ভাবে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। ভগবানের নিকট হইতে যখন আসে, তখন সকল শিশুই দেবভাবাপন্ন থাকে, মানুষের হাতে পড়িয়া তাহারা নষ্ট হইয়া যায়—ইহা নিছক কবির কল্পনা। বাস্তবের সহিত ওই কল্পনার

কোনও সম্বন্ধ নাই। মনোবিজ্ঞান পরিষ্কারভাবে আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে যে, জন্মাবধিই ভিন্ন ভিন্ন শিশুর প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং একটি শিশুর প্রতি যে শিক্ষাবিধি প্রযোজ্য, অপরের পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। জোর করিয়া সকলের শিক্ষা একধারামত চালাইলে শিক্ষাপ্রণালীটিই অনেক শিশুর পক্ষে শিক্ষার বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। শিশুর রুগ্নাবস্থায়, শ্রান্ত অবস্থায়, কোনও কোনও বিশেষ ভাবের অবস্থায় তাহাকে শিক্ষাদানের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক শিশুর কোনও বিষয়-বিশেষ শিক্ষা করিবার বা কোনও বিশেষ কার্য্য করিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যদি ওই বিষয় বা কার্য্য শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের হানিকর না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। নতুবা উৎসাহভঙ্গহেতু তাহাদের অভীপ্সিত বিষয়ও তাহারা শিক্ষা করিবে না, পরন্তু অন্য বিষয় শিক্ষা করিবার আগ্রহ ও চেষ্টাও তাহাদের নষ্ট হইয়া যাইবে।

শিক্ষার পারিবারিক বাধার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয়, শিশুর পিতামাতা ও তাহার পরিবারের অন্যান্য সকলের শিশুমনের বিকাশের ধারার সহিত পরিচয়ের একান্ত অভাবের কথা। অভিভাবক-দিগের অজ্ঞতার জন্য কত শিশুর ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া যায়, সে বিষয়ে আমাদের ধারণাই নাই। শিশুর শিক্ষা যে তাহার জন্মের মুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ হয়—এ কথা ভুলিয়া গিয়া আমাদের ব্যবহারের দ্বারায় প্রায়শই আমরা একটি অবাঞ্ছনীয় পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করি।

শিশুর বাল্যজীবনের উপর তাহার পিতামাতার প্রভাব যে কতদূর ও কিরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী, মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কর্ত্তা ফ্রয়েড তাহা দেখাইয়াছেন। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিমাত্রেরই চরিত্রের মূল সূত্রগুলি

পাঁচ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়া যায়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু তাহার পিতামাতা ও পরিবারবর্গের মধ্যে বাস করে; সুতরাং পিতামাতার দায়িত্ব যে কত গভীর, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এই দায়িত্বজ্ঞান তাঁহাদের এখনও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। চিরাচরিত প্রথামত কখনও অযথা ভৎ'সনা, কখনও অযথা আদর করিয়া পুত্রকন্যাকে স্কুলে পাঠাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন। আবার অনেক শিক্ষকই স্কুলে কোনও প্রকারে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে পারিলে কার্য্য শেষ হইল বিবেঁচনা করেন। পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের এই মনোভাব শিক্ষার একটি বিশেষ অন্তরায়।

কিরূপে এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করা যায়, এই বাধা দূর করা যায়, ইহাই এখন চিন্তার বিষয়। একটি উপায় হইতেছে—শিক্ষাবিষয়ক নূতন তথ্যগুলি সাধারণের মধ্যে বহুলপ্রচার। নানারূপ পরীক্ষালব্ধ নূতন জ্ঞান যদি শুধু কয়েকটি বিশেষজ্ঞের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়রূপেই বিরাজ করিতে থাকে, তাহাতে লাভ কি? সেই জ্ঞানের উপকারিতা কি, যাহা কখনও কার্য্যে প্রকাশ পায় না? জনসাধারণের এবং সমাজের হিত-কল্পে বিশেষজ্ঞদিগের ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়—পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রভৃতি সকলকে সহজভাবে ও সরল ভাষায় শিক্ষার নূতন ধারা ও প্রণালীর বিষয় পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করা ও তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে ঘন ঘন আলোচনা করা।

এইখানে আমি আধুনিক বাঙালী-পরিবারের জীবনযাত্রার ধারা ও শিক্ষার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে চাই। আমাদের সমাজে বহুকাল যাবৎ যুক্তপরিবার-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হয়তো পুরাকালে সকল দিক দিয়াই এই প্রথার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ও উপকারিতা ছিল। এখনও এরূপ পরিবারে বাস করা যে কতক বিষয়ে, যেমন ব্যয়সঙ্কোচ বিষয়ে, অনেকেরই স্নবিধাজনক, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যুক্তপরিবারের যে পরিণাম বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে, শিক্ষার দিক হইতে দেখিলে উহার আর অধিককাল অবস্থিতি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। আমি যেরূপ ধারণা করিতেছি, সকল যুক্তপরিবারেরই যে সেইরূপ অবস্থা, তাহা হয়তো নাও হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশেরই অবস্থা যে সেইরূপ, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিলেই পুরাকালের কথা মনে করিয়া পরস্পরের প্রতি মৈত্রী, আত্মত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যে সমাবেশের কল্পনা করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, বাস্তবিক পক্ষে সেই কল্পনানুযায়ী সুখময়, শান্তিময় সংসার সেকালেও ছিল কি না, তাহা অনুসন্ধানের দ্বারা অবধারণ করিবার বিষয়। যাহা হউক, অতীতের সহিত আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ের যোগাযোগ নাই। আধুনিক অধিকাংশ যুক্তসংসারই প্রচ্ছন্ন হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির এবং প্রকাশ্য অশান্তির লীলাভূমি। পরস্পরের মতের অমিল, অন্তরে বৈরীভাব পোষণ করিয়া বাহিরে সদ্‌ব্যবহারের অভিনয়, ইহাই আধুনিক যুক্তপরিবারের চিত্র। ফলত, কৃত্রিমতাই এই সকল সংসারের মূল ভিত্তি। এইরূপ সংসার শিশুর শিক্ষার পক্ষে যে কত প্রকার বাধার সৃষ্টি করে, তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমেই স্মরণ করা প্রয়োজন যে, শৈশবে উপদেশ-বাক্যের দ্বারা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। মিথ্যা কথা বলিও না, পরের দ্রব্য লইও না—এই ধরনের উপদেশ প্রত্যেক শিশুই বহুবার শুনে এবং পাঠ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তকে পড়ে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শিশু-মাত্রেই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে ও পরের দ্রব্য লইয়া থাকে।

শিশুদিগের অনুকরণ-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল এবং ইহারই সাহায্যে বাল্যে তাহারা বহু বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। যেরূপ ব্যবহার তাহারা দেখিতে পায় বা যেরূপ কথোপকথন ও আলোচনা তাহারা শুনিতে পায়, তাহারা সেইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকে ও সেইরূপ কথাবার্ত্তা শিখিয়া থাকে। অভিভাবকদিগের মুখে অনেক সময় তাঁহাদের শিশুর সম্বন্ধে এই অভিযোগ আমরা শুনিতে পাই—"আমরা ছেলেবেলায় অমন করি নি বা ওরকম ছিলুম না, এসব কথা উচ্চারণ করতেই পারতুম না।" কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, শিশুদের মনের এই অপ্রত্যাশিত পরিণতির জন্য তাঁহারা নিজেরাই প্রধানত দায়ী। তাঁহাদের বাল্যকালের ব্যবহার শিশুরা দেখে নাই; সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহারা করিতে পারে না। তাঁহাদের এখনকার ব্যবহার কিন্তু তাহারা প্রতিনিয়ত দেখিতেছে এবং শিক্ষা করিতেছে। সুতরাং Example is better than precept—এই প্রবচন অভিভাবকদের প্রতিমুহূর্ত্তেই স্মরণে রাখিয়া সংযত হইয়া কথাবার্ত্তা বলা ও কার্য্য করা বিশেষ প্রয়োজন।

আর একটি বিশেষ কথা—শিশুর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা অতিশয় তীক্ষ্ণ; কিরূপ তীক্ষ্ণ, তাহা আমরা সাধারণত ধারণাই করি না। পিতামাতা প্রভৃতির ভাবের সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেই শিশু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারে। যুক্তপরিবারভুক্ত ব্যক্তির শিশুর সমক্ষে সংযত হইয়া ও সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলা অতীব কঠিন। পরিবারবর্গের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ ভাব বর্ত্তমান, কে কাহার প্রতি আসক্ত ও কাহার প্রতি বিরক্ত, শিশু তাহা উত্তমরূপেই বুঝে। সুতরাং কোন এক ব্যক্তির প্রতি বিরক্তির ভাব গোপন করিয়া শিশুকে তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়ার কোনই মূল্য নাই। সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা তো

করিবেই না, উপরন্তু উপদেশদাতা গুরুজনের ব্যবহার হইতে প্রতারণা করিতে শিখিবে। ইহা কি সুশিক্ষা?

পিতামাতার মধ্যে মনোমালিন্য থাকা শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিঘ্নকর। যুক্তপরিবারে এই মনোমালিন্য সৃষ্ট হইবার ও বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রচুর। উপযুক্ত স্থলে ক্রোধ, অসন্তোষ, বিরক্তি প্রভৃতি প্রকাশ করিতে না পারিয়া শিশুর প্রতি তাহাদের অভিব্যক্তি যুক্তপরিবারে ক্রমাগতই হইয়া থাকে। অন্যায়ভাবে তিরস্কৃত বা অপমানিত হইলে শিশু কখনই ক্ষমা করে না। প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও বা না করিলেও এইরূপ শাস্তিদাতার প্রতি ক্রোধ ও শত্রুভাব পোষণ করিতে থাকে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের গোপনে বিরুদ্ধতাভাব পোষণ করা তাহার শিক্ষার পক্ষে একটি গুরুতর অন্তরায়। দুইটি শিশুর প্রতি এককালে দুই রকমের ব্যবহার তাহাদের যথাযথ মানসিক বিকাশের পক্ষে কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়। সম্মুখ তুলনা দ্বারা বা প্রকাশ্য ব্যবহার দ্বারা একটিকে ছোট করা ও আর একটিকে বড় করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিবেন, যুক্তপরিবারে এই ঘটনা অনবরতই ঘটিয়া থাকে। ছেলেদের বিদ্যা, চতুরতা, শৌর্য্য প্রভৃতি লইয়া এবং মেয়েদের গৃহকর্ম্মে নিপুণতা, গীতবাদ্যাদিতে পারদর্শিতা প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ আলোচনা ও তজ্জনিত যে মনোভাব সন্তানসন্ততির এবং তাহাদের পিতামাতাদের মধ্যেও সৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে সবিশেষ অন্তরায়।

আর এক দিক হইতে দেখিলে এরূপ পরিবারের প্রধান দোষ এই যে, সর্ব্ববিষয়ের "valuation"-এর, অর্থাৎ "প্রাণ এবং মনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে উপকারিতার হিসাবের" একেবারে ওলটপালট হইয়া যায়। অনেক সময় ক্ষুদ্র কাজ, তুচ্ছ কথা বড় হইয়া উঠে, এবং

প্রকৃতপক্ষে যে কার্য্য, যে কথা দামী, তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। যেমন এরূপ পরিবারে শিশুদের প্রতি প্রায়ই যথোচিত লক্ষ্য থাকে না। তাহাদের প্রত্যেক কথা, প্রশ্ন, খেলা, খাদ্য, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল সময়েই সতর্ক থাকা প্রয়োজন, এ কথা অভিভাবকেরা, বিশেষত মায়েরা তাঁহাদের গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, একেবারেই ভুলিয়া যান। যে পরিবারে লোক-সংখ্যা অধিক, গৃহকর্ম্মও অধিক। কর্ম্মপ্রবাহের সামান্য বিরামের সময় শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ আসিয়া মায়েদের মানসিক বৃত্তিসমূহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শিশুদের বিষয় চিন্তা করিবার বা তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা বা অবকাশ আদৌ থাকে না। অশান্তির আবহাওয়ার মধ্যে দিনের পর দিন এইভাবে যাপন করিয়া যাঁহাদের নিজেদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইতে থাকে, তাঁহারা শিশুদের শিক্ষার উন্নতির সহায়ক কিছুতেই হইতে পারেন না। পরিবারের মধ্যে কেহ অধিক উপার্জ্জনশীল, কেহ কম, কাহারও সন্তানসন্ততির সংখ্যা অধিক, কাহারও কম হওয়া অত্যন্তই স্বাভাবিক। আজকালকার ব্যক্তিতন্ত্রতার দিনে এরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন একই পরিবারের ব্যক্তিবর্গের শুধু পারিবারিক একতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত একত্র বাস করিবার চেষ্টাতে সকল দিক দিয়াই, বিশেষত মানসিক সুখশান্তির দিক দিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে। সদ্‌বৃত্তিসমূহের অপচয় এবং মিথ্যা, হিংসা, ছলনা প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তির প্রশ্রয়, ইহাই এরূপ জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী নৈতিক পরিণাম। এই নিতান্ত অশুভ পরিবেষ্টনীর মধ্যে পালিত শিশুর সুশিক্ষা কি করিয়া আশা করা যায়? শিক্ষাশাস্ত্রাভিজ্ঞ পিতামাতাও পরিবারস্থ সকলের পরস্পরের মতের অনৈক্য হেতু তাঁহাদের জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পদে পদে

বাধাপ্রাপ্ত হন। পুরাতনত্বের দোহাই দিয়া ও নীতি প্রবচনের সাহায্য লইয়া এই যুক্তপরিবার-প্রথা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা যতদিন চলিবে, ততদিন শিক্ষাবিস্তারের পথে একটি প্রবল বাধা থাকিয়া যাইবে।

একান্ন-পরিবারে বাস একটি সামাজিক প্রথা, সুতরাং ওই বাধাকে সামাজিক বাধাও বলা চলে। প্রাণবন্ত সমাজমাত্রই গতিশীল। কালের গতির সহিত সমাজের আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। আমাদের সমাজিক আচার-ব্যবহারের বহু পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সমাজের আদর্শের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না সন্দেহ। পুরাতন হইতে নূতন সামাজিক ব্যবহারের যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশই আসিয়াছে অন্য দিক হইতে এবং দ্বিধা ও ভয়ের সহিত তাহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রতান্ত্রিক অবস্থাবিপর্য্যয় সমাজের বহু প্রচলিত ধারার তিরোধান ও নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তনের হেতু। কার্য্যে এই সকল পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেও, সমাজের আদর্শবিষয়ক চিন্তাধারায় ইহাদের উপযুক্ত স্থান আমরা দিই নাই। চিন্তা এবং কার্য্যের মধ্যে এই ব্যবধান থাকাতে আমাদের সামাজিক জীবনে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষা-ব্যাপারটি অতিশয় সূক্ষ্ম—"delicate", কোনরূপ বিশৃঙ্খলার আবহাওয়ার মধ্যে উহার সুষ্ঠু পরিণতি হইতে পারে না। শিশুমনও অতিশয় নরম এবং গ্রহণশীল—receptive, অতি সহজেই এবং শীঘ্রই উহাতে দাগ বসিয়া যায়। শিশুর মনে একবার যে ছাপ অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা দূর করা একপ্রকার অসম্ভব। সংজ্ঞান হইতে মুছিয়া দিলেও শিশুর নির্জ্ঞানে তাহা থাকিয়া যায় এবং তথা হইতে সংজ্ঞানে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। আমি এবং আমার পরিবারবর্গ যদি কোন একটি আদর্শ মানিয়া চলি, শিশু সহজেই সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আমি

একমতাবলম্বী এবং অন্য সকলের মধ্যে কেহ আমার সহিত একমত এবং কেহ অন্যমত, এইরূপ হইলেই শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। উপরন্তু সমাজের এখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, আমরা নিজেরাই সব সময়ে এক মত অনুসারে চলিতে পারি না। ফলে নিজেদের ব্যবহারের মধ্যে বহু অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। শিশুদের আমরা যতই অপরিণত মনে করি না কেন, এই অসামঞ্জস্য তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ অতিক্রম করে না। কাজেই কোন একটি বিশেষ নিয়ম, যাহা নিজেরা কখন মানি, কখন মানি না, শিশুদের উপর প্রয়োগের চেষ্টা করা অর্থাৎ তাহাদের discipline-এর মধ্যে আনা শক্ত হইয়া পড়ে। একটি দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে পড়িতেছে। বাটীর স্ত্রীলোকেরা—শিশুর পিতামহী, মাতা প্রভৃতি পূজাপার্ব্বণ ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। শিশুরাও যাহাতে এই সকল কর্ম্মে উৎসাহান্বিত হয়, তাহার চেষ্টাও তাঁহারা করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক বাটীতেই পুরুষেরা ওই সকল বিষয়ে হয় উদাসীন থাকেন অথবা নানারূপ উপহাসাদি করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় শিশুদের মনোভাব কি হইতে পারে? তাহারা হয় ওই সকল বিষয়ে উৎসাহান্বিত হইবে অথবা ওই সকল অনুষ্ঠানকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখিবে। কিন্তু ওইখানেই ব্যাপারটি শেষ হয় না। শিশু যে মত অবলম্বন করিবে, তাহার প্রতিকূল মতাবলম্বী সকলের প্রতি অবজ্ঞার ভাব মনে পোষণ করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাই হইল বিপদের কথা।

এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দেওয়া যায় যে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত আমাদের নিজেদের মনোভাবের অনিশ্চয়তা-হেতু শিশুর মনে অযথা অনেক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করি, কিন্তু সেগুলির সমাধানের কোন পন্থা তাহাকে দেখাইতে পারি না। সহজ অবস্থাতেই

শিশুর মনে স্বভাবতই কত দ্বন্দ্বের—conflict-এর উৎপত্তি হয়, ফ্রয়েড তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শুধু সেগুলিরই যথাযথভাবে সমাধান করিবার জন্য শিশুকে সাহায্য করিতে হইলে অভিভাবকদের নিজেদের আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় ও সংযম অভ্যাস করিতে হয়। পরিণত বয়সের মনোবিকারের ও মানসিক রোগের অঙ্কুর যে অনেক সময় শৈশবের দুষ্ট আবহাওয়া-বশতই রোপিত হয়, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। শৈশবের আবহাওয়ার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকবর্গ প্রধানত দায়ী। সামাজিক বিশৃঙ্খলা-হেতু নূতন নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়াতে শিক্ষা-ব্যাপারটি জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। তাই statistics-এ দেখি, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

এই বিশৃঙ্খলার অপনোদন কি করিয়া হইবে, এক কথায় বলা যায় না। কারণ, ওই সমস্যার সহিত নানা প্রশ্ন বিজড়িত। তন্মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থাই প্রধানতম। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না হইলে কোনরূপ স্থায়ী সামাজিক অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না। অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের শাসনপদ্ধতি, রাজনীতি প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সুতরাং হঠাৎ কোনরূপ সুফলের আশা করা সমীচীন নহে। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশভাবে সমস্ত চেষ্টা বন্ধ করিয়া স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া বসিয়া থাকা—শুধু অবিবেচক নহে, একেবারে কাপুরুষের মত কার্য্য হইবে। কোন বাধাই অনতিক্রমণীয় নহে। দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, হিমালয়শিখর লঙ্ঘন করিবার অক্লান্ত চেষ্টা দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায়ের সহিত চলিতেছে। কালে সে চেষ্টা যে সফল হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের ওইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। আলোচনা, আন্দোলন

দ্বারা জাতীয়তাগঠনের ভিত্তি যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে, জনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। তখন সমস্যার সমধান আপনা-আপনিই হইবে।

জাতিগত পার্থক্য আমাদের সমাজের একটি প্রাচীন নিয়ম। যদিও অর্থনৈতিক তুমুল আলোড়নের ফলে ওই নিয়মের অধুনা কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহার প্রাবল্য যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে এখনও আমরা মনে মনে কুণ্ঠিত হই এবং যাঁহারা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সমাজের উচ্চস্তরে তাঁহাদের স্থান দিতে দ্বিধা বোধ করি; অন্তত যতক্ষণ না তাঁহারা স্বর্গগত সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। কলকব্জার কার্য্য, মিস্ত্রী, ফোর্‌ম্যান প্রভৃতির কার্য্যকেও আমরা অবজ্ঞাই করিয়া থাকি। বস্তুত, কোনপ্রকার হস্তশিল্প বা শারীরিক-পরিশ্রমজনিত কার্য্যই আমরা শিক্ষিত যুবকদের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। আমাদের এই মনোভাব শিক্ষার অন্তরায় বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। একেই চাকুরি ভিন্ন—তাহা আবার সামান্য কেরানীর চাকরি—বিশেষ কোনও পন্থা আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের জন্য উন্মুক্ত নাই, তাহার উপর যাঁহাদের অর্থ এবং সুবিধা আছে, তাঁহারাও যদি ওইরূপ মনোভাবের বশীভূত হইয়া পুত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষাদানে বিরত থাকেন, তাহা হইলে সমাজের পক্ষে বিশেষ দুঃখের বিষয় হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু দুঃখের বিষয় নয়, সমাজের ক্ষতিরও কারণ হয়। পুত্র চাকুরি-সংগ্রহের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিল না, এবং ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিতেও মনোমত কার্য্যে যোগদান করিতে পারিল না, ফলে সমাজ ন্যায্য দাবি সত্ত্বেও

তাহার নিকট হইতে কোনরূপ উপকার লাভ করিল না। সমাজের সে একটি ভারস্বরূপ হইয়াই রহিল।

সর্ব্বশেষে এবার যে বাধাগুলির কথা বলিব, সেগুলি অতীব গুরুতর। একের চেষ্টায় বা এক পরিবারের উদ্যমে তাহাদের দূর করা সম্ভব নয়। দেশের সকল লোকের, বিশেষত যাঁহাদের হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং নূতন চিন্তাধারাপ্রসূত নূতন কর্ম্মপদ্ধতি প্রচলন ভিন্ন তাহাদের নিরাকরণ হইবে না। আমি দেশের দারিদ্র্য এবং গভর্মেণ্টের অনুদার শিক্ষানীতির বিষয় বলিতেছি। শিক্ষা-বিষয়ক জ্ঞান আমাদের যতই উন্নত হউক না কেন, এক দারিদ্র্য-দোষ আমাদের সেই জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে প্রবল বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে, আমার শিশুর কোন একটি বিষয়ে—যেমন চিত্রাঙ্কনে—বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ আছে এবং কৃতিত্বের পরিচয়ও দিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন্ ভরসায় আমি তাহাকে শুধু চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতে পারি? অনেক অভিভাবকদের নিকটেই এই সমস্যার উদয় হয়। তাই শিক্ষাশাস্ত্রাভিজ্ঞ হইলেও অনেককেই তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিয়া চলিত পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। নূতন জ্ঞান লাভ করিবার বা সেই জ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সুযোগ বা সামর্থই বা আমাদের কয়জনের আছে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক শিক্ষক কোনক্রমে বিদ্যালয়ে তিন চার ঘণ্টা কাল কাটাইতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন। ইহাতে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষতি হয় তাহা নিশ্চিত। কিন্তু বহু শিক্ষককে বাধ্য হইয়াই যে ঐরূপ করিতে হয়, তাহা কি একটি বিবেচনার বিষয় নহে? যাঁহার অভাব চিরস্থায়ী, তাঁহার উদ্যম কোথা

হইতে আসিবে? দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতেই যাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়, তাঁহার অন্য কাজে উৎসাহ কিরূপে হইবে? শিক্ষকদিগের অভাব-অভিযোগ, অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে গভর্মেণ্ট মনোযোগী না হইলে প্রতিকারের উপায় কোথায়?

শিক্ষার কতকগুলি অন্তরায়ের বিষয় আলোচনা করিলাম। নূতন কথা হয়তো কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু অনেক বিষয়েই পুরাতন কথারও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করার যে প্রয়োজন আছে, আশা করি, সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

মাঘ, ১৩৪৫

নূতন মনোবিদ্যা

মানুষের মন স্বতই বহির্মুখী। বাহিরের জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ; অন্তরের জিনিসের খবর লওয়া কঠিন, তাই সাধনসাপেক্ষ। কেবল শিশুরাই শুধু বাহিরের জিনিস লইয়া ভুলিয়া থাকে। শিশুর বয়স বৃদ্ধি হইলে, কিশোর যৌবনে পদার্পণ করিলে, বাহিরের জিনিস শুধু বাহিরের জিনিস হিসাবে আর তাহার মনে স্থান পায় না। বাহিরের জিনিস যখন নিজের মনের প্রতিবিম্বরূপে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির বিষয়রূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ডাকে যুবকের মন সাড়া দেয়। মন তখন সুখদুঃখ অনুভব করিতে শিক্ষা করিয়াছে, নিজের দিকে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, অন্তর্দৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। জীবনধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, সাধারণত ততটুকু অন্তর্দৃষ্টিই বিকশিত হয়, ততটুকুই যথেষ্ট।

ব্যষ্টি-মন যে পথ ধরিয়া বিকশিত হয়, সমষ্টি-মনের বিকাশের পথও তদ্রূপ। তাই বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম যুগে পদার্থবিদ্যাই একমাত্র আলোচনার বিষয়, সমষ্টি-মন তখন শিশু-মনের মতই বহির্মুখী। Newton, Kepler, Galileo এই যুগের পুরোহিত। তাহার পর এই সমষ্টি-মন যখন নিজের দিকে ফিরিল, মনোবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। Fechner, Wundt প্রভৃতি এই যুগের প্রবর্ত্তক।

মনোবিদ্যার আলোচনায় দেখা গেল, মন সমতলভূমি নহে। এখানে পর্ব্বত আছে, সমুদ্র আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, স্রোতস্বতী ধারা আছে, সুগন্ধপুষ্প-পরিপূর্ণ উদ্যান আছে, আবার জঘন্যকীটপতঙ্গাদি-সমাকুল অন্ধকারময় গহ্বরও আছে। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে আমরা

মনের এই পরিচয়ই পাই। সাহিত্যে বালির বাঁধ ভাঙিয়া প্রেমের বন্যা বহে, করুণাধারায় জগৎ প্লাবিত হয়, প্রতিজ্ঞা হিমালয়ের মত অটল থাকে, Vesuvius-এর অগ্ন্যুদ্গীরণের ন্যায় হঠাৎ ক্রোধের বিকাশ হয়, হিংসার বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, আবার প্রশান্ত মহাসাগরের মত স্থির ধীর উদার চরিত্র বিরাজ করে।

কিন্তু যুগের হাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এখন হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কত উচ্চ, কেবলমাত্র তাহা জানিয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় না; সেই অত্যুচ্চ শিখরে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য তথায় অভিযান করে। মহাসাগরের মহাগভীরতার বিষয়ে শুধু জ্ঞান লাভ করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাহার সর্ব্বনিম্ন স্তরে কি রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা জানিবার জন্য মানুষ তথায় পৌছাইতে চেষ্টা করে। বহির্জগতে যেরূপ, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। মানব-মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূল কি, মনোরাজ্যের সর্ব্বনিম্ন স্তরে কি আছে, তাহা জানিবার কৌতূহলও অদম্য হইয়া উঠিল। তাই মনের মধ্যেও ডুবুরী নামিতে লাগিল। Vienna শহরের এক মহাপণ্ডিত প্রথম এই গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ আলোকের সাহায্যে সেই প্রদেশে লুক্কায়িত চিন্তা-কণার ও ভাব-সমষ্টির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি সেই বিষয় সকলকে জানাইলেন। কিরূপে, কোন্ পথে তথায় প্রবেশ করিতে পারা যায়, তাহারও ইঙ্গিত করিলেন। কেহ বিশ্বাস করিল, বহু লোক করিল না। ক্রমে অনেকেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার আবিষ্কারের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইলেন। Vienna-র সেই পণ্ডিতের, সেই প্রথম পথনির্দ্দেশকের নাম Sigmund Freud। আজ তাঁহার নাম বিশ্ববিখ্যাত; তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ সর্ব্বজনবিদিত।

সেই সর্ব্বজনবিদিত মনোবিশ্লেষণের পন্থার নাম Psycho-Analysis বা মনঃসমীক্ষণ। সর্ব্বজনবিদিত হওয়ায় এক দিকে যেমন এই বিদ্যার ব্যাপ্তির পরিচয় পাই, অন্য দিকে তেমনই এই সম্বন্ধে ধারণার বৈলক্ষণ্যও যথেষ্ট দেখি। অসম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণারও অভাব নাই। যাহা হউক, সেই সমস্ত প্রচলিত ধারণার যথার্থতা বা অযথার্থতা বিচার না করিয়া এই প্রবন্ধে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

কারণ বিনা কার্য্য হয় না—এ কথা প্রকৃতির ব্যাপার সম্বন্ধে মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি হয় না। ইহাই হইল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্‌দের গোড়ার কথা। কিন্তু মানসিক ব্যাপারে এই রীতি মানিয়া লইতে পূর্ব্বে অনেকেই ইতস্তত করিয়াছেন, এখনও করেন। মনোবিদ্যা-বিষয়েও এই রীতি যে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য, শুধু যুক্তিশাস্ত্রের দিক হইতে নয়, দৈনন্দিন মানসিক কার্য্যকলাপের বিশ্লেষণ হইতেও তাহা দেখা যায়। যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপারে, তেমনই মানসিক ব্যাপারেও আকস্মিক (chance) বলিয়া কোন জিনিস নাই। হঠাৎ আমার মনে কোন চিন্তার উদয় হইল, হঠাৎ অস্বাভাবিক ক্রোধের উদ্রেক হইল, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে কি কারণে ওই চিন্তার, ওই ভাবের উদয় ওই সময়ে হইয়াছিল, তাহা ধরা পড়িবে। বস্তুত এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানসিক ব্যাপারেও মানিয়া লইতে না পারিলে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা অসম্ভব হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি মানুষের ইচ্ছা, মানুষের চিন্তা স্বাধীন নয়? সমস্ত কার্য্যকলাপই কি তাহার নিয়মের দাস? তাহা হইলে ধর্ম্ম, সমাজনীতি প্রভৃতির অর্থ কি? এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিবার অবকাশ হইবে না; শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে

চাই যে, ধর্ম্ম সমাজনীতি সংক্রান্ত ধারণা ও আদর্শসমূহও মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। মনের আইন মানিয়া তাহারাও চলে। ধর্ম্মভাবেরও পরিণতি হয়, সমাজনীতিরও ক্রমবিকাশ আছে।

মনঃসমীক্ষণ মনকে বল ও গতিধর্ম্মশালী (dynamic) বলিয়া মানে। প্রাকৃতিক ব্যাপার যেমন এক জড়শক্তির নানা রকমের বিকার মাত্র, মানসিক ব্যাপারও সেইরূপ এক মানসিক শক্তির নানা ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। মনঃসমীক্ষকদের এই ধারণা মনোবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে নূতন নহে। তবে মনের বিভিন্ন স্তরের কল্পনা ও তাহাদের কার্য্যাবলীর বিচারই মনঃসমীক্ষণের নূতন ও অমূল্য দান।

আমরা যখন কোন একটি বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকি, তখন সেই বস্তুটিই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাই। তাহার আশপাশের দ্রব্যাদিও দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ততটা পরিষ্কারভাবে নয়। আরও দূরের জিনিস আর দেখিতে পাই না। মনোজগতেও এইরূপ। এখন এই মুহূর্ত্তে যে বিষয়টি চিন্তা করিতেছি, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুটভাবে মনের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা এখনও আবার মনে করিতে পারি, তাহা অত পরিস্ফুট নহে, তাহা যেন ঠিক এই স্তরের নিম্নে আছে। আবার অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহা এখন একেবারেই মনে করিতে পারি না, মনের সর্ব্বনিম্ন স্তরে তাহাদের স্থান কল্পনা করিতে পারি। এই তিনটি স্তরের নাম যথাক্রমে conscious বা সংজ্ঞান, pre-conscious বা আসংজ্ঞান ও un-conscious বা নির্জ্ঞান।

এই যে কোন কোন কথা একেবারেই মনে করিতে পারি না, তাহা সকলেই জানেন। ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক হইলেও, কি ভুলিয়া যাইব, আর কি মনে করিয়া রাখিব,

তাহার মধ্যে যে একটি সমস্যা রহিয়া যাইতেছে, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করেন না। বাল্যকালের একটি কথা কেন ভুলিয়া গেলাম, সে সময়ের আর একটি কথা কেনই বা মনে করিয়া রাখিলাম, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার বিষয়। এই অনুসন্ধানের ফলেই নির্জ্ঞান সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে ফ্রয়েড অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মনোবিদ্যার দিক হইতে এই চর্চ্চা আরম্ভ করেন নাই। তিনি চিকিৎসক; মানসিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসাকল্পে, বিশেষত একটি হিষ্টিরিয়া-রোগীর চিকিৎসাকালে তিনি এই সমস্ত তত্ত্বের সন্ধান পান। ক্রমশ এই তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহার প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন; এবং সেই অবধি, মনোবিদ্যালোচনার সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই, এই কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাঁহার মতে কামই আমাদের অনেক কার্য্যের, অনেক চেষ্টার মূল। এ কথায় চমকিত হইবার, কিংবা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিবার কিছুই নাই। কাম শব্দ অতি ব্যাপক। ইহাতে শুধু স্ত্রীপুরুষের রমণেচ্ছাই বুঝায় না। চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে কাম শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ফ্রয়েডের Libido বা কাম সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের আইন মানিয়া তাহাকে চলিতে হয়; তাই তাহার সমস্ত প্রকারের অসামাজিক ইচ্ছা পূরণ হইতে পায় না। ইচ্ছা হইলেই আর একজনকে মারিয়া ফেলা যায় না। কতক ইচ্ছা তাই দমন করিতেই হয়। এরূপ অসামাজিক ইচ্ছা যে মানুষমাত্রেরই, এমন কি সামাজিক হিসাবে খুব উন্নত ব্যক্তিরও, মনে মাঝে মাঝে উদয় হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সাহিত্যিকদের মধ্যে সমালোচককে দুই ঘা

কষাইয়া দিবার ইচ্ছা বোধ হয় খুব বিরল নহে। সকলের অপেক্ষা অসামাজিক ইচ্ছা, এবং সেইজন্য সকলের চেয়ে বেশি অবদমিত হয় কাম-সংক্রান্ত ইচ্ছা। তাই মনঃসমীক্ষণশাস্ত্রে কামের কথা এত বেশি থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন বল ও গতিধর্ম্মী। যে সমস্ত ইচ্ছা অবদমিত হয় অর্থাৎ নির্জ্ঞানে চলিয়া যায়, তাহারা তথায় নিশ্চেষ্ট থাকে না। জোর করিয়া ডোবানো সোলার মত ক্রমাগত উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে থাকে ; কিন্তু সোজা পথে উপরে উঠিতে তাহারা বাধা পায়। কোথা হইতে বাধা আসে, তাহাই এইবার বলিব।

সভ্যতার ও সমাজের কতকগুলি আদর্শের ভিতর দিয়া শিশুমন গঠিত হইতে থাকে। শিশু সে আদর্শগুলিকে বিচার না করিয়া অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে। সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন স্তরের সংঘাতে ক্রমশ মনের মধ্যেই একটি ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন Censor বা প্রহরী। প্রহরী বা Censor-এর কাজ কি, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার কৃপায় তাহা বুঝিতে আর কষ্ট করিতে হইবে না। মনের প্রহরী যাহা কিছু অসামাজিক বলিয়া মনে করে, তাহাই অবদমন করে। যে ইচ্ছা অবদমিত হয়, তাহা যে বাস্তবিক আমাদের নিজের মনেরই ইচ্ছা, তাহা জানিতে পারি না। প্রশ্ন হইতে পারে, এরূপ অবদমিত ইচ্ছা যে আছে, তাহা স্বীকার করিব কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।

আমরা দেখিতে পাই, সমুদ্রের স্রোত এক দিকে, কিন্তু ইহাতে ভাসমান বরফের স্তূপ অন্য দিকে চলিতেছে। উহা হইতে এই তথ্যে উপনীত হওয়া গেল যে, বরফস্তূপের যতটুকু অংশ উপরে দেখিতেছি ততটুকুই উহার সব নয়। নীচে আরও আছে ; এবং নীচের জলের

স্রোতের টানে অন্য দিকে চলিতেছে। আগ্নেয়গিরি হইতে হঠাৎ ধূম নির্গত হইতে থাকিলে এই সিদ্ধান্তই করি যে, যদিও অগ্নি দেখিতে পাইতেছি না, গিরি-গুহাভ্যন্তরে উহা বিদ্যমান আছে। এইরূপ সর্ব্বাবস্থাতেই কার্য্য দেখিয়া আমরা কারণ অনুমান করি এবং পরে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করি। মানসক্ষেত্রেও ঠিক ঐ ভাবেই বিচার করিতে হইবে। একটি লোকের অপর কোন ব্যক্তির সহিত ব্যবহারে যদি দেখিতে পাই, দ্বিতীয়োক্তটি ঘরে আসিলেই প্রথমোক্তটি উঠিয়া যায়, অন্য লোকের সহিত মিষ্ট আলাপন করিলেও ইহারা দুইজনে পরস্পরের সহিত মন খুলিয়া কথা কয় না, তাহা হইলে উহারা স্বীকার না করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে সদ্ভাবের নিশ্চয়ই প্রাচুর্য্য নাই। সেইরূপ, নিজের ব্যবহার নিজেই বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিলে যদি এইরূপ কোন ঘটনার আভাস পাই, তাহা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমার মনে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি শত্রুভাব লুক্কায়িত আছে। সংজ্ঞানে তাহার প্রতি বিরূপতার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাওয়া যাইলেও নির্জ্ঞানে তাহার কারণ বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে। আবার শুধু যুক্তির দিক দিয়া নয়, যখন দেখা যাইতেছে, ফ্রয়েড এবং অন্যান্য দেশে আরও অনেক চিকিৎসক—যেমন, Ferneczi, Jones, Brills—আমাদের গিরীন্দ্রশেখরবাবুও ওই তথ্য ভিত্তি করিয়া মানসিক ব্যাধির প্রতিকারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তখন নির্জ্ঞান মনে অবদমিত ইচ্ছা প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়তর না হইয়া আর পারে না।

সাধারণত নির্জ্ঞানের ও সংজ্ঞানের মধ্যে একটা আপোস বন্দোবস্ত থাকে। সেই বন্দোবস্তের ব্যতিক্রম ঘটিলেই দৈনন্দিন ব্যবহারে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। সামান্য বাতিক হইতে আরম্ভ করিয়া দুরারোগ্য

মানসিক ব্যাধি পর্য্যন্ত তাহা হইতে ঘটিতে পারে। অধিকাংশ মানসিক রোগের লক্ষণগুলি অবদমিত ইচ্ছার প্রতীক মাত্র; কিংবা সেই ইচ্ছাকে সংজ্ঞান আক্রমণ করিতে না দিবার ছল মাত্র।

সহজ মানুষেরও অবদমিত ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি অনেক প্রকারে হয়। একটি উপায় স্বপ্ন। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই স্বপ্ন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে অসমর্থ। একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, বহুদিনবিস্মৃত বহুদূরস্থিত কোন বন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে, শয্যাপার্শ্বে তাহার আত্মীয়স্বজন ক্রন্দন করিতেছে। এক সপ্তাহ পরে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। এই ধরনের দৃষ্টান্ত হয়তো কেহ কেহ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপস্থিত করিতে পারিবেন। প্রশ্ন এখানে, স্বপ্ন ভবিষ্যদ্বাণী কি না! এরূপ দৃষ্টান্ত স্বপ্ন-সাহিত্যে বেশি আছে বলিয়া আমার জানা নাই। স্বপ্নের ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-সাপেক্ষ কি না, তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যুক্তিসম্মত সহজ সরল ব্যাখ্যা থাকিতে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয় বলিয়াই মনে হয়।

স্বপ্ন যে ইচ্ছারই পরিস্ফূর্ত্তি, ছোট শিশুদের স্বপ্নে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। ছেলেকে লইয়া Botanical garden-এ যাইবার প্রস্তাব হইল। তাহাতে সে বেশ মাতিয়া উঠিয়া অনেক আশা, অনেক কল্পনা করিল; কিন্তু কার্য্যগতিকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না; ছেলে দমিয়া গেল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল, সে Botanical garden-এ বেড়াইতেছে। এখানে কার্য্যত যে ইচ্ছা পূরণ হইল না, স্বপ্নে তাহা কাল্পনিকভাবে চরিতার্থ হইল। বয়স্ক ব্যক্তিদের ইচ্ছা সব সময় অত সরল কিংবা অত নির্দ্দোষ হয় না। তাই সেই সব ইচ্ছা অত সহজে সংজ্ঞানে আসিতে পারে না। তখন ইচ্ছার এক-একটি অংশ এক একটি প্রতীকের সাহায্যে

স্বপ্নে দেখা দেয়। নিজের হিংস্র-প্রকৃতি ব্যাঘ্রের রূপে দেখা দিল; যাহার উপর আক্রোশ, সে হয়তো অন্য ক্ষুদ্র জন্তুরূপে আসিল; এবং স্বপ্নে দেখিলাম, ব্যাঘ্র ভীষণভাবে ক্ষুদ্র জন্তুটিকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপে নিজের বাসনা চরিতার্থতা লাভ করিল। যেরূপ দেখি, সেই ভাবেই লইলে স্বপ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। ফ্রয়েড বলেন, স্বপ্নে যাহা বাস্তবিক দেখি, তাহা উহার manifest content বা ব্যক্ত অংশ। উহার অনেকটাই প্রতীক দিয়া গঠিত। সেই সমস্ত প্রতীকের অর্থ নির্ণয় করিতে পারিলে যাহা পাই, তাহা উহার latent content বা স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ। এই অব্যক্ত অংশের ভিতর অসামঞ্জস্য কিছুই থাকে না। পরস্পরসঙ্গতিসম্পন্ন পরিষ্কার অর্থ তাহা হইতে পাওয়া যায়, এবং সেই অর্থ আবার অতৃপ্ত অবদমিত বাসনার পরিতৃপ্তি। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে, সে খালি পায়ে কেবলমাত্র চাদর গায়ে দিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছে। ওই বেশ অশৌচের প্রতীক। বিশ্লেষণে জানা গেল, সে তাহার পিতার মৃত্যুকামনা করিতেছে।

সুস্থ ব্যক্তিদের ইচ্ছার নির্জ্ঞান হইতে সংজ্ঞানে আসিবার আর একটি উপায়ের নাম sublimation, অর্থাৎ উদ্গতি। কোন অসামাজিক ইচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়াতে যদি সেই বৃত্তি কোন সমাজ-অনুমোদিত পথ অবলম্বন করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে উদ্গতি। শিশুকালে অন্যের কোন অঙ্গদর্শনবাসনা হইতে পরিণত বয়সে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় অনুরক্তি হওয়া ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করার কথা নূতন নহে। ব্যর্থপ্রেমিক হঠাৎ শিকারী হইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার জঙ্গলে বড় বড় জানোয়ার শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিংবা হঠাৎ অসম্ভব রকম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল, এরূপ দৃষ্টান্তের

অভাব কি? সাহিত্যে এরূপ চরিত্র আপনারা নিজেরাই অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন।

এইরূপ সমস্ত সোজাসুজি পথ যখন উন্মুক্ত না থাকে, তখনই রোগের সূত্রপাত হয়। মানসিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অদমিত বাসনা যে কত রকমে নিজেদের চরিতার্থতা লাভে প্রয়াস পায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক-একটি রোগীর এক-একটি পথ। তবে কতকগুলি বড় বড় লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া রোগসমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত বর্ণনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অসংখ্য রোগীর আত্মকথা শুনিতে শুনিতে ফ্রয়েড আর একটি সারবান তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ও সেইমত কার্য্য করিতে পারিলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। এই তথ্য শিশুমন-সম্বন্ধীয়।

সাধারণত সকলেরই ধারণা, শিশুমন বড় নির্দ্দোষ; শিশুমনে যে কাম-বাসনার কালিমাময় কোন আঁচড় পড়িতে পারে—এ কথা বাতুলের প্রলাপের ন্যায় উড়াইয়া দিবার যোগ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কাম-বাসনা কালিমাময় কি না বা মনে তাহার উদ্রেক হওয়া দোষের কি না, সে বিচার মনোবিদ্‌রা করেন না। যাহা হয়, তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। সুতরাং ওই বিশেষণগুলি বাদ দিয়া তাঁহারা বলেন, শিশুমনে কামের উদ্রেক হয়। কিশোর-বয়সে হঠাৎ একদিন কাম-চেতনা জাগে না। কিশোর-বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নানা স্তরের ভিতর দিয়া ওই কামপ্রবৃত্তি আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। এমন কি ফ্রয়েডের মতে পাঁচ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মানব-চরিত্রের মূলভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। কামপ্রবৃত্তির এই ক্রম-জাগরণের একটি বিশেষ ধারা আছে ও অনেকগুলি স্তর আছে। মানসিক-রোগীমাত্রেরই

রোগের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ধারার কোন না কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদিগের পিতামাতার কিংবা অন্য যাঁহাদের উপর তাহাদের ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহাদের অজ্ঞতা-নিবন্ধনই উহা ঘটিয়াছে ; কতক ক্ষেত্রে সহজাত দোষই ইহার কারণ।

এইবার, আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অবদমিত ইচ্ছা কিরূপে আপনাকে ব্যক্ত করে, তাহার কিছু পরিচয় দিব। একটি পরিচিত নাম প্রয়োজনের সময় বিস্মৃত হওয়া বোধ হয় কোন না কোন সময়ে সকলের অভিজ্ঞতাতেই আসিয়াছে। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা অনেক সময় দেখা যায়, সেই নামের সহিত কোন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা জড়িত আছে। সেই অভিজ্ঞতাটি পুনরায় মনে আনিতে চাহি না ; তাই তাহার সহিত জড়িত নামটিও ভুলিয়া যাই। হাসপাতালে কোন রোগীর একটি নার্সের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু হাসপাতাল হইতে ফিরিবার পর নার্সকে পত্র লিখিবার সময় তাহার বড় মুশকিল হইতে লাগিল। কিছুতেই নার্সের পদবী মনে করিতে পারে না। নার্সের চিঠি দেখিয়া কিছু সুবিধা হইল না, কারণ সমস্ত চিঠিতেই সে গোড়ার নামই সই করিয়াছে। একবার ক্রমান্বয়ে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পদবী মনে করিতে পারিল না এবং পত্রও পাঠাইতে পারিল না। বিশ্লেষণে জানা গেল, লোকটি পূর্ব্বে আরও দুইটি মেয়েকে ভালবাসিয়াছিল। তিন-জনেরই প্রথম নাম একই। সে নাম সে ভুলে নাই। পদবীটি ভুলিয়া যাইয়া তিনজনকে এক করিয়া মনে মনে সে তাহার প্রেমের পাত্রের নিকট খাঁটিই রহিয়া গেল। আমাদের যাহা দেয়, তাহা ভুলিয়া যাই, যেমন রবিবাসরের চাঁদা প্রভৃতি, কিন্তু যাহা প্রাপ্য তাহা মনে থাকে। পকেটের চিঠি পকেটেই থাকিয়া যায়, ডাকে দিতে ভুলিয়া যাই। কোন

জায়গায় যাইবার কথা দিয়া যাইতে ভুলিয়া যাই। অনেক সময় একটি কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথা ব্যবহার করিয়া বসি। সাধারণত ঐরূপ ভুলসমূহ আকস্মিক বলিয়া চলিয়া যায়। একটি মহিলা বার্নার্ড শয়ের লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন, "I think very highly of all my writings." তিনি নিজে ছোটগল্প লিখিতেন। এখানে ভুলের অর্থ সকলেই উপলব্ধি করিবেন। ডক্টর জোন্সের এক বন্ধু মোটরে আস্তে আস্তে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় একটি লোক সাইকেলে রাস্তার ভুল দিক দিয়া অতি বেগে আসিয়া ধাক্কা লাগাইল, তাহার যান চুরমার হইয়া গেল। সরাইয়া লইয়া জোন্‌সের বন্ধুর নিকটে পঞ্চাশ ডলারের এক বিল পাঠাইল। বন্ধু দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আদালতে নালিশ করিল। বন্ধুর সহিত দেখা হইতে জোন্‌স মামলার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু বলিলেন, "জজসাহেব অসাবধানতার সহিত সাইকেল চালাইবার জন্য কয়েদীকে তিরস্কার করিয়াছেন।" জোন্‌স বলিলেন, "কয়েদীকে? ফরিয়াদীকে বল!" বন্ধু বলিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু উহার জেলে যাওয়াই উচিত ছিল।" এখানে ইচ্ছা কথার ভুলে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। খামে ভুল ঠিকানা লেখা, জিনিসপত্র—যেমন ছাতা লাঠি ইত্যাদি—এখানে ওখানে ফেলিয়া যাওয়া প্রভৃতি যতই অকারণ ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হউক না কেন, সকল ভুলেরই কারণ আছে, অনুসন্ধান করিলে বাহির করা যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে, যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সহিত কোন না কোনরূপ অপ্রীতিকর স্মৃতি জড়িত থাকে, তাহা সহজে পুনরায় মনে আসে না। অনেক সময়ে তাহার বিপরীতও হইতে পারে; যেমন কোন বন্ধু-গৃহে বই ফেলিয়া আসিবার কারণ সেই বন্ধু-গৃহে পুনরায় যাইবার ইচ্ছা। সমস্ত ভুলই ঠিক এক নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না।

প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করিতে হইবে। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যেকটির কারণ আবিষ্কার করিতে পারা যায়।

মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে নানা দিক হইতে নানা রকমের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও এবং সেই সমস্ত প্রশ্নে উত্তর সম্বন্ধে নানাবিধ মতদ্বৈধ থাকিলেও উহার উপকারিতা সম্বন্ধে মতভেদের আর কোনও কারণই নাই। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া সুস্থ ও অসুস্থ লোকের মানবিক অবস্থার, সামাজিক রীতিনীতির, পুরাকালের আচার-ব্যবহারের, ধর্ম্ম-কর্ম্মের এমন একটি সুন্দর সহজ সঙ্গত ব্যাখ্যা মনঃসমীক্ষণ দেয় যে, তাহা অপূর্ব্ব। আবার মানসিক রোগ সারাইবার, শিশুচরিত্র গঠন করিবার, সমাজের দোষগুণ ফুটাইয়া তুলিবার এরূপ মহামূল্য উপায় পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ দান। ইহার প্রভাবে ভবিষ্যতে সমাজের সমস্ত কর্ম্মধারার যে আমূল পরিবর্ত্তন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যিনি এ অমূল্য দান করিয়াছেন, আমরা সম্প্রতি তাঁহার সপ্ততিতম জন্মমহোৎসব করিয়াছি। আশা করি, তিনি এখনও বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের এবং তাহার ভিতর দিয়া অন্য সমস্ত শাস্ত্রেরই উৎকর্ষ সাধন করিতে থাকিবেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

মনের বিভিন্ন স্তর

মন সম্বন্ধে আলোচনা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বহু শতাব্দী হইতেই চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানের আদর্শ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং এক যুগে যে জ্ঞান যথেষ্ট ও উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, পরবর্ত্তীযুগে তাহার অপরিপূর্ণতা এবং অনুপযুক্ততা অনুসন্ধিৎসুদের পীড়া দেয় এবং তাঁহাদের নূতন তথ্য অনুসন্ধানে প্ররোচিত করে। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে হইবে যে, আলোচনার ধারা বিজ্ঞানসম্মত হইতেছে কি না! সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিশেষত্ব কি?

পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে সত্য আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের নিজের আলোচনার বিষয়গুলিকে নানা দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়া নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, পরীক্ষা করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির বিষয় যে পরীক্ষা করা চলে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

শুধু পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এবং পরীক্ষা (experiment) না করিয়াও যে সত্যে উপনীত হওয়া যায়, জ্যোতির্ব্বিদদের নৈসর্গিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করিবার ক্ষমতা হইতেই তাহা প্রমাণ হইয়াছে ও হইতেছে।

মানুষের মন প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় নয়। চিন্তায়, ভাবে, কর্ম্মেই

তাহার প্রকাশ। চিন্তার ধারা, ভাবের অভিব্যক্তি, কর্ম্মের উদ্যম লক্ষ্য করিয়াই আমরা অপরের মনের সম্বন্ধে কল্পনা করি। অন্য লোকের মানসিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সচরাচর পক্ষপাতশূন্য হয় না। বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপ আচরণ করিতে দেখিয়া আমরা হয়তো তৎক্ষণাৎ সেই লোকটির মন সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া বসি। ইহাতে হয়তো সেই লোকটির প্রতি সুবিচার করা হয় না। মন সম্বন্ধে কিরূপে নিরপেক্ষ এবং সুসংযত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, মনোবিদ্‌রা তাহার বিজ্ঞানসম্মত উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় তাঁহাদের জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণের উপরেই বিশেষ করিয়া নির্ভর করিতে হয়। যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানসিকতার পরীক্ষামূলক গবেষণা গত শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লাইপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক ভূণ্ড্‌ট ইহার প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই পরীক্ষার রীতি পদার্থবিদ্‌দিগের বা রসায়নবিদ্‌দিগের বহুযুগ-অনুসৃত রীতির সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করা ভুল হইবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা প্রভৃতি তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, মনোবিদ্যা যে তত শীঘ্র সেই পরিমাণে উন্নতি করিতে পারিবে, সেরূপ ধারণা করা সমীচীন নয়। পদার্থবিদ্যার বস্তু এবং মনোবিদ্যার বস্তুর সম্বন্ধে মূলগত পার্থক্য আছে, এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের একটা সীমা আছে। ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মনোবিদ্যার চর্চ্চা যে বৈজ্ঞানিক নয়—এ কথা মানিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করাই বিজ্ঞানের একমাত্র পন্থা নহে। নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণ এবং ন্যায়সঙ্গত বিচার ও সিদ্ধান্ত—ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূলভিত্তি। যে আলোচনায় এই দুইটির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহাকেই আমরা বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলিব।

আধুনিক মনোবিদ্যায় এই দুই উপাদানই যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না—এই আপত্তি সর্ব্বতোভাবে ভ্রমাত্মক এবং সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়।

স্থূল পর্য্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া মন ও তাহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত এতদিন চলিয়া আসিতেছিল, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে তাহাদের কোন্‌গুলি বজায় রাখা চলে এবং কোন্‌গুলি অচল, এক শ্রেণীর মনোবিদ্‌গণ তাহা স্থির করিতে নিজেদের ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। পরীক্ষার নানা পন্থা প্রদর্শন করা, নানারূপ যন্ত্রের আবিষ্কার করা—তাঁহাদের কার্য্য হইয়াছে। পৃথিবীর প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়মাত্রেই এখন, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, মনোবিদ্যার একটি পরীক্ষাগার আছে। সেই সমস্ত আগারে পরীক্ষামূলক গবেষণার দ্বারা নানা সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা ভূণ্ড্‌ট, ফেক্‌নার প্রভৃতির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক দিক দিয়া এইরূপ প্রচেষ্টা যখন চলিতেছিল, তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য এক দিক হইতে মনোসন্ধানের আর একটি পন্থা আবিষ্কৃত হইল। সহজগম্য না হইলেও সে পথ অনুসরণ করিলে যে মন-সম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে, বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তাহা যিনি বিশদভাবে দেখাইয়া দিলেন, তিনি মনোবিদ্‌ নন—একজন চিকিৎসক। বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সেই চিকিৎসকের নাম সুপরিচিত এবং তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহারই আবিষ্কৃত কয়েকটি তত্ত্ব এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এই চিকিৎসকের নাম Sigmund Freud। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মধ্য-ইউরোপে অধুনাতন চেকোশ্লোভাকিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পরে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে বাস করেন এবং জীবনের

অধিকাংশ কালই ওই শহরে অতিবাহিত করেন। শেষজীবনে রাষ্ট্রীয় কারণে তাঁহার চিরকালের বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এই মনীষী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মানসিক-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা-কালে তিনি মনের কার্য্যধারা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্যের নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন। অন্য বিশেষজ্ঞেরা এইরূপ নির্দ্দেশ পাইয়াও নানা কারণে মন সম্বন্ধে গভীরতর আলোচনা হইতে বিরত রহিলেন, কিন্তু ফ্রয়েড একাকী বহুবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অবজ্ঞাভাজন হইয়াও, আদর্শ বৈজ্ঞানিকের মত সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সত্যনিষ্ঠার ফলে আজ আমাদের শুধু যে মন সম্বন্ধে জ্ঞানই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, শত শত ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী তাহাদের দুরারোগ্য ব্যাধির দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করিলেন যে, আমাদের মন নিজেদের অজ্ঞাতসারে অনেক কাজ করিয়া থাকে। আমাদের মনের যেটুকু পরিচয় আমরা জানি, তাহা মনের অতিশয় সামান্য অংশ। মনকে একটি বরফের পাহাড়ের সহিত (Iceberg) তুলনা করিলে মনের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা সহজসাধ্য হইবে। Iceberg-এর যেমন অতি সামান্য অংশ জলের উপরে থাকে এবং বেশির ভাগই নীচে থাকে, সেইরূপ মনের অতি সামান্য অংশ সম্বন্ধেই আমরা সচেতন থাকি এবং অধিকাংশ অংশই আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। যে অংশ

সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইতে পারি, আধুনিক মনোবিদ্যায় তাহাকে সংজ্ঞান বলে ; এবং যে অংশ আমাদের সম্যক জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়, তাহাকে নির্জ্ঞান মন বলা হয়। এই নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে কল্পনা করিবার যৌক্তিকতা পুরাকালের দার্শনিকেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করেন নাই। এই নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে গভীর আলোচনা এবং বহু তথ্যের আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মহামূল্য দান।

মন গতিশীল। স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তেই নানারূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। বাল্যকাল কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি এই প্রবহমান মনের এক-একটি কাল্পনিক অংশবিশেষ। আপনারা জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবনের কার্য্যাবলী আপনাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করেন, কিন্তু সেই পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা কি সব সময়ে আপনাদের সংজ্ঞানে থাকে ? না, থাকে না। কিন্তু চেষ্টা করিলে অনেক ঘটনাই স্মৃতিপথে উদিত হয়। স্মৃতিপথে আসিবার পূর্ব্বে তাহারা মনের যে স্তরে থাকে, তাহাকে আসংজ্ঞান (Preconscious) বলা হয়। চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেক ঘটনা মনে আসে না, সেই সমস্ত ঘটনার কথা মনের যে স্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে নির্জ্ঞান মন বলা হয়।

বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হইতেছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, মনটি একটি বস্তুবিশেষ, যাহাকে ইচ্ছামত ভাগ করা চলে এবং মনোবিদ্‌রা তাঁহাদের ইচ্ছামত পরস্পরসম্পর্কবিহীন তিনটি ভাগে (সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান, নির্জ্ঞান) ভাগ করিয়া লইয়াছেন। মনের

কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি, তাহা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে স্তরের উপমা যথেষ্ট সাহায্য করে বলিয়াই মনোবিদ্‌রা মনের এইরূপ বিভিন্ন স্তরের কল্পনা করিয়াছেন এখন এই নির্জ্ঞান মনের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা যাউক। যে সমস্ত কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই, আধুনিক মনোবিদ্যার পরিভাষায় আমরা বলিব যে, সেই সমস্ত কথা নির্জ্ঞানে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের ভুলিয়া যাইবার কারণ কি? দুইটি ঘটনা পূর্ব্বকালে একই সময়ে ঘটিয়াছে। একটির কথা আমাদের মনে থাকিলেও আর একটির কথা ভুলিয়া যাই। ঘটনার পুরাতনত্বই যে ভুলিবার একমাত্র কারণ, তাহা বলা চলে না। ফ্রয়েড দেখিয়াছিলেন যে, আমাদের ভুলিয়া যাইবার ইচ্ছাই অনেক সময়ে ভুলিয়া যাইবার কারণ। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য তাহার মনে নানারূপ ইচ্ছার উদয় হয়, কিন্তু সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শের সহিত তাহার অনেক ইচ্ছার সামঞ্জস্য থাকে না। এই সমস্ত অসামাজিক ও নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা যে তাহার মনে উদয় হইয়াছিল—এ কথা সে নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চায় না, তাই সেই ইচ্ছার কথা সে ভুলিয়া যাইতে চায়, অর্থাৎ নির্জ্জনে সরাইয়া দেয়। কিন্তু নির্জ্জনে পাঠাইলেই যে সেই সমস্ত ইচ্ছার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহা নহে। ফ্রয়েড দেখিলেন যে, নির্জ্ঞান মন নিষ্ক্রিয় নহে। নির্জ্ঞান মনে নিহিত সমস্ত অবদমিত মানসিক বৃত্তিই সংজ্ঞানে আসিবার চেষ্টা করে, তাহার ফলে নির্জ্ঞান মনে ক্রমাগতই একটু ওলটপালট চলিতেছে এবং তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে। সংজ্ঞান মন কিন্তু, নির্জ্ঞান মনের কোন বৃত্তিই যাহাতে সহজ ও সোজাসুজি ভাবে তাহার সীমানার মধ্যে আসিতে না পারে, তজ্জন্য একটা প্রহরীর (censor) সৃষ্টি করিয়াছে। প্রহরীর সহিত সংঘর্ষ এবং তাহার

সজাগ দৃষ্টি এড়াইবার জন্য নির্জ্ঞান মনের বৃত্তিগুলিকে অনেক সময় নানা ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিতে হয়। সাধারণ লোকের স্বপ্ন ওই ধরনের একটা ঘটনা। স্বপ্নে নানারূপ প্রতীকের ছদ্মবেশ লইয়া নির্জ্ঞাননিহিত বৃত্তি সংজ্ঞানে প্রবেশ করে। সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের এই সংঘর্ষই অধিকাংশ মানসিক রোগের কারণ। মানসিক রোগের লক্ষণগুলি সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানে আপোস-মীমাংসা বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সমস্ত তথ্য বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধ অনেক বড় হইয়া যাইবে। সুতরাং এখন সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম।

মানসিকব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের মানসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতেই ফ্রয়েড এই সমস্ত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন—এ কথা সত্য; কিন্তু এখন দেখা যায়, সহজ সাধারণ মানুষ বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি, তাহাদের মন সম্বন্ধেও এই মানসিক স্তর প্রভৃতি বহু তথ্যই প্রযোজ্য। তাই ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ এখন মনোবিদ্যা-চর্চ্চারই একটি বিশেষ পন্থারূপে স্বীকৃত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, মানুষের মন যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে ও করে, সমস্তই এই নবাবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণ-তথ্য দ্বারা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। পৌরাণিক কাহিনী, কলাবিদ্যা, সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম, সাহিত্যের গতি প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই রহস্য ইহার সাহায্যে উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া আমরা ভরসা করি। একদল উৎসাহী, ধৈর্য্যশীল, মেধাবী, পরিশ্রমী ছাত্র এই কার্য্যে ব্রতী হউন—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

আশ্বিন, ১৩৪৬

কথোপকথনে মনস্তত্ত্ব

পরস্পরের কথোপকথনের মধ্যে মনোবিদ্যার দিক হইতে লক্ষ্য করিবার বিষয়, আমার মনে হয়, প্রধানত তিনটি। বিষয়বস্তু, ভাষার গতি বৈচিত্র্য প্রভৃতি এবং মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অবয়বের ভঙ্গী। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম কথোপকথনের বিষয়বস্তু। কোন এক বিষয়ে যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মৌখিক আলোচনা করেন, তখন সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত তো ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াই থাকেন। সেই মতামত বিশ্লেষণ করিলে তাঁহাদের মানসিকতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই রকম নানা বিষয়ের কথোপকথন হইতে তাঁহাদের চিন্তার ধারা, ভাবের গতি, তাঁহাদের নৈতিক বিচারের মানদণ্ড, ধর্ম্মে আস্থা বা অনাস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাইয়া তাঁহাদের মানসিকতার বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করা খুব শক্ত নয়। শক্ত নয় সত্য বটে, কিন্তু এখানে একটি বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। যে সমস্ত মতামত লোকে কথাবার্ত্তায় প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই মত যে তাহারা সত্য-সত্যই পোষণ করে এবং তাহাদের জীবনের কার্য্যাবলী যে সেই মত অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত করে, এ কথা কি সব সময় মানিয়া লওয়া যায়? যদি ব্যক্ত মতামতের সঙ্গে তাহাদের কৃত কার্য্যের সামঞ্জস্য সব সময় বজায় থাকিত, তাহা হইলে তো মানুষমাত্রেই দেবতা ও পৃথিবী অমরাপুরী হইত। ভাষা যেমন মনোভাব প্রকাশ করে, তেমনই আবার তাহা গোপন করিতেও তো সাহায্য করে। আমি এ কথা অবশ্য বলিতে চাহি না যে, সকল লোকে, যে মতে তাঁহাদের বিশ্বাস নেই বা যে ভাব

তাঁহাদের আন্তরিক নয়, সেই মত এবং সেই ভাবই অনবরত প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছেন। আমি শুধু এইটুকু মনে করাইয়া দিতে চাই যে, মতামত এবং কথোপকথনের ধারা সব সময় বিষয়বস্তুর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। কাহার সহিত কথা বলিতেছি, তিনি গুরুজন না সমবয়স্ক বন্ধু, কি রকম পরিবেষ্টনীর মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এসবও কথাবার্ত্তার উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মতামতের হিসাবনিকাশ করিবার সময় এসবগুলার দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

আধুনিক মনোবিত্থা একটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। যে সমস্ত মতামত সত্যসত্যই কোন ব্যক্তি পোষণ করে, তাহাদের ভিত্তি যে সর্ব্বদা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। ধরুন, একজন হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান বলেন যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাঁহার নিজের ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাঁহার এই উপনীত সিদ্ধান্ত কিন্তু ঠিক কতদূর যে তাঁহার ওই বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটা একটি ভাবিবার কথা। আমাদের মনের একটি স্তর আছে, যাহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমরা একেবারেই সচেতন নাই, তাহাকে নির্জ্ঞান মন (the unconcious mind) বলা হয়। আমরা সচরাচর আমাদের যে মনের বিষয় সচেতন থাকি, তাহার নাম সংজ্ঞান মন (the concious mind)। মনোবিত্থার নূতন আবিষ্কারের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আমাদের সংজ্ঞান মনের কার্য্যাবলীর উপর এই নির্জ্ঞান মনের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। আমাদের অনেক কার্য্যাকার্য্য, চিন্তাধারা, মতামত, ভাবপ্রণালী এই নির্জ্ঞান মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, যদিও আমরা তাহাদের সংজ্ঞান-মন-প্রণোদিত বলিয়াই মনে করি। অতএব মনোবিত্থার দিক হইতে আমরা এইটুকু জ্ঞানলাভ

করিয়াছি যে, কথোপকথনে ব্যক্ত মতামত হইতে বক্তার মানসিকতা সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নয়।

অন্য এক পথে অগ্রসর হওয়া যাক। যেখানে কথোপকথনের বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, সেখানে ব্যক্তিবিশেষ কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বতই কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে সেই ব্যক্তির মন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আমার পরিচিত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন, যিনি জিনিসের বাজার-দর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে কথা কহিতে একেবারেই ভালবাসেন না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনস্তম্ভ ভিন্ন আর যে কিছু পড়িবার বা দরকারী কথা থাকে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। এই রকম কাহারও ঝোঁক খেলাধূলা বিষয়ে, অন্যের সিনেমা এবং ফিল্ম-স্টার সম্বন্ধে কাহারও প্রীতি-ভোজন ও ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধে, আবার কাহারও কথাবার্ত্তার একমাত্র বিষয় আপিস এবং বড়বাবু। বাহিরের দিক হইতে এগুলি লক্ষ্য করিলে মানুষের বিভিন্ন রুচির, চিন্তাধারার আভাস পাওয়া যায়। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই রুচির ও চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত ভিত্তিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন মনোবিদ্ বলিয়াছেন, মানবজাতিকে বড় দুই ভাগে ভাগ করা চলে— extrovert এবং introvert। যাঁহারা extrovert, তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই বহির্মুখী; তাঁহারা বাহিরের পাঁচ রকম জিনিস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে, কথা কহিতে ভালবাসেন; সকলের সঙ্গে মিশিতে, দল বাঁধিতে, অগ্রণী হইতে উৎসাহ তাঁহাদের যথেষ্ট। Introvert-রা সব সময় নিজেদের লইয়াই ব্যস্ত, দৃষ্টি তাঁহাদের অন্তর্মুখী, পাঁচজনে তাঁহাদের সম্বন্ধে কি বলিবে, কি ভাবিবে, এই চিন্তাই তাঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তোলে। তাই কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা স্বভাবতই দ্বিধাযুক্ত ও পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পড়েন। অবশ্য সম্পূর্ণ extrovert এবং নিছক introvert লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ। সাধারণ লোক এই দুইয়ের মাঝামাঝি, তবে কাহারও ঝোঁক extroversion-এর দিকে কিছু বেশি, কাহারও introversion-এর দিকে।

এ কথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, দেশকালপাত্র হিসাবে কথোপকথনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইয়া থাকে। অল্পবয়স্ক শিশুদের খেলা, গল্প, রূপকথা প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সুতরাং তাহাদের কথাবার্ত্তার বিষয়বস্তুও ঐসকল সংক্রান্তই হইয়া থাকে। কৈশোর চরিত্রগঠনের কাল—সাধারণত এই বয়সে একটি আদর্শবাদীর (idealistic) ভাব মনে জাগে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের স্বপ্নে, বৃহৎ কর্ম্মধারার পরিকল্পনায় কিশোরের মন মাতিয়া উঠে। বড়লোকের জীবনী, তাঁহাদের কার্য্যধারা প্রভৃতি আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষের চিন্তাধারার বিভিন্নতা এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। যৌবনে সকল বিষয়েই আগ্রহ উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক, যদিও কৈশোরের আবেষ্টনী ও পরবর্ত্তী কালের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে সকলেরই বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে অনুরাগ বিরাগ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। প্রৌঢ় ব্যক্তিদের শারীরিক অসুস্থতার বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ছাড়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আলোচ্য বিষয় সম্ভবত নব্যদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আধুনিক সমাজের দ্রুত অধোগতি। প্রৌঢ়ারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে "আজ কি রান্না হ'ল গো দিদি" বলিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেও রন্ধনই যে একমাত্র তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, এ কথা বলা চলে না। ঘরকন্নার খুঁটিনাটি এবং পুত্রবধূদের ও পৌত্রপৌত্রীদের সদসৎ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করাটাই বোধ হয় তাঁহারা সমধিক পছন্দ করেন।

কথোপকথনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মনোবিদ্যার দিক দিয়া কিছু বলা হইল। এবার ভাষার বৈচিত্র্য, গতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি। কেহ কেহ স্বভাবতই উচ্চভাষী, রাস্তার এ-মোড়ে কথা কহিলে ও-মোড়ে শোনা যায়। কাহারও কথা আবার দুই হাত তফাতে দাঁড়াইলেও শোনা যায় না। কেহ দ্রুতভাষী, কেহ অতি ধীরে কথা বলেন। এইরূপ বৈচিত্র্যের কারণ কি? আপনারা হয়তো বলিবেন বৈচিত্র্য থাকিবে না, সকলেই কি এক রকম ভাবে, এক সুরে, এক রকঃ গলায় কথা কহিবে? তাহা হইলে তো জীবনধারণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন তাহা নহে। সংসারে বাস করিতে হইলে বৈচিত্র্যের যে বিশেষ দরকার, তাহা আমরা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আমার প্রশ্ন হইতেছে এই যে, 'ক'-ই বা দ্রুতভাষী হইলেন কেন, 'খ' হইলেন না কেন, 'গ'-এর সব সময় ওই রকম তারস্বরে কথা কহিবার কোন বিশেষ কারণ আছে কি? যেখানে কণ্ঠ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের জন্য আবশ্যকীয় অঙ্গের কোন বিকৃতি নাই, সেখানে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে অনুমান করিতে হইবে। আমি যদি বলি, বাল্যকালে 'গ' পিতামাতা এবং অন্যান্য লোকের ব্যবহার হইতে এই ধারণা করিয়াছিল যে, তাহারা 'গ'-এর কথায় মনোযোগ দেন না, বরং তাহার নূতন ছোট ভাইটির উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের দাম বেশি দিয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য 'গ' উচ্চৈঃস্বরে কথা কওয়াই আরম্ভ করিয়াছিল এবং তখন হইতে ওই রকম ভাবে কথা কওয়াই নিজের অজ্ঞাতে তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; আপনারা হয়তো মনে করিবেন, এটি একটি কাল্পনিক ব্যাখ্যা। কিন্তু আপনারা আশ্বস্ত হইতে পারেন যে, ওই ধরনের কোন একটি মানসিক ব্যাপারই প্রত্যেক লোকের কথা কহিবার যে একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে, তাহার কারণ। অনেক শিশু

একমাত্র মানসিক কারণেই তোতলামি করে। ইংলণ্ডে সায়েন্স অ্যাসোশিয়েশনের বিগত অধিবেশনে সম্প্রতি এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। একজন মনোবিদ্ একটি সাত বছরের বালিকার তোতলামি শুধু তাহার মানসিক পরিবেষ্টনীর পরিবর্ত্তন দ্বারা কি রকমে সারাইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন।

মনে কোন রকম ভাবের উদয় হইলে—যেমন ভয়, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি—শরীরের ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ হয়। বজ্রমুষ্টি, রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে ক্রোধ সহজেই অনুমান করা যায়। এই সমস্ত ভাবের প্রভাব কণ্ঠ প্রভৃতি মাংসপেশীসমূহের উপরেও ক্রিয়া করে। তাই কণ্ঠাগত স্বরসমূহেরও নানারূপ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। স্বরের তারতম্যে আমরা তাই ভাবের বিচার করিতে সমর্থ হই।

কথার মধ্যে কতকগুলি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক কথা রীতিমত ব্যবহার করা অনেকেরই—বোধ হয় সকলেরই—অভ্যাস আছে। এক ভদ্রলোক দুইটি কথা বলিবার পরেই একবার করিয়া 'কি বলে যেয়ে' বলিয়া থাকেন। "আমি যখন কাল 'কি বলে যেয়ে' রাজা সন্তোষ রোডে গিয়েছিলুম, তখন 'কি বলে যেয়ে' শরৎ বাড়ি ছিল না।" এই রকম করিয়া তিনি কথা কন। 'মানে', 'বুঝলেন কিনা', 'বুঝেছেন কি', 'ওর নাম কি হ্যাঁ' এই ধরনের কতকগুলি কথা প্রায়শই অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই রকম কোন বিশেষ কথা বা কথার সমষ্টি যখন কেউ ব্যবহার করেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহার জীবনের কোন একটি বিশেষ ঘটনার সহিত ওই কথা বা কথাসমষ্টির যোগাযোগ আছে, এবং ওই যোগাযোগ সম্ভবত তাঁহার নির্জ্জান মনের কাজ।

কথা কহিবার সময় এক কথা বলিতে আর এক কথা বলা, উদ্দিষ্ট একটি কথার পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতে অনুদ্দিষ্ট আর একটি কথা উচ্চারণ করা,

ইংরেজীতে যাহাকে 'Slips of the tongue' বলে, এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ঐগুলি বিশদভাবে আলোচনা করিলে বক্তার মনের অনেক কথা জানা যায়। মনোবিদ্যা বলে, অজ্ঞাতে যে অনুদ্দিষ্ট কথাটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, সে কথাটি তোমার সংজ্ঞান মনের না হইলেও নির্জ্ঞান মনের উদ্দিষ্টই। অতএব তোমার কথা একেবারে অনুদ্দিষ্ট বলা চলে না। চিঠি পকেটে রাখিয়া ডাকে দিতে ভুলিয়া যাওয়া, সামনে জিনিস থাকিতে খুঁজিয়া না পাওয়া, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির নাম ভুলিয়া যাওয়া প্রভৃতি ব্যাপার ইহারই অনুরূপ। ইহাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে নির্জ্ঞান মনে প্রবেশ করিতে হইবে।

এইবার তৃতীয় ও শেষ পর্ব্বে আসা যাক। কথোপকথনের সময় শুধু আমাদের জিহ্বাই যে কাজ করে, তাহা নয়; আমাদের সমগ্র মুখমণ্ডল, শুধু মুখমণ্ডল কেন, অন্যান্য অবয়বও, তাহাতে যোগদান করে। একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, মানুষ শুধু মিথ্যা কথা বলিয়া সত্যকে ঢাকিতে পারে না। জিহ্বা কপটাচরণ করিলেও অন্যান্য অবয়ব তাহাদের ভঙ্গিমার দ্বারা সত্য প্রকাশ করিয়া দেয়। সুতরাং যিনি এই সকল অঙ্গভঙ্গী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহার কাছে শুধু মিথ্যা কথা বলিয়াই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ভাষা উচ্চারণের সঙ্গে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী যোজনা করা একটি শিল্প—'art'; চিন্তা ভাব প্রভৃতির সঙ্গে অঙ্গ-চালনার স্বাভাবিক যোগ আছে বলিয়াই এই শিল্পের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। কথাবার্ত্তার সময় অঙ্গভঙ্গীর উপর লক্ষ্য রাখিলেও তাই বক্তাদের মানসিকতার কিছু তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

ভালবাসা

আমি কবি নই। বস্তুত প্রবন্ধকার, গল্পলেখক, নভেলিস্ট, নাট্যকার, সমালোচক প্রভৃতি সাহিত্যিকদের যেসব শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহার কোন শ্রেণীতেই আমার স্থান নাই। আবার মনোবিদ্ নামে যে এক সম্প্রদায় সম্প্রতি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের আমি বিশেষ ভয় করিয়াই চলি। কারণ, অনেক সময় অনেক সত্য কথা তাঁহারা এমন ভয়ানক স্পষ্টভাবে বলেন যে, নিজেদের মনের দিকে চাহিতে আর সাহস হয় না। "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এই অমূল্য মহাবাক্যটিকে তাঁহারা একেবারে আমলই দিতে চান না। আমার এই সমস্ত মারাত্মক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যে আমি ভালবাসা বিষয়ে আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেটা হয়তো অনেকে আমার ধৃষ্টতার পরিচয় বলিয়া মনে করিবেন। হইতে পারে, এটা আমার পক্ষে একটা দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ হইতেছে এই যে, সকলকেই যে সব বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া তার-পর কথা কহিতে হইবে, এ মতটা আমি গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি না। পূর্ণজ্ঞান আদর্শ বটে, কিন্তু তাহা তো আকাশ হইতে হঠাৎ আসিয়া পড়ে না! সাধারণ লোকের সাধারণ ধারণার বিচার ও আলোচনা করিতে করিতেই তো তাহাদের ভিতর যেসব ভুলভ্রান্তি অসঙ্গতি থাকে, সেগুলা ধরা পড়ে। তখন সেই দোষগুলা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াই তো আমরা ক্রমশ পূর্ণজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হই। আমি তো অন্তত এই রকম বুঝি, আর সেইজন্যই জ্ঞানের কিছুমাত্র গভীরত্বের দাবি না রাখিয়াও ভালবাসা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা মনে আসে, তাহার

কিছু প্রকাশ করিবার সাহস (দুঃসাহস?) করিয়াছি। তাহা ছাড়া ইহা বোধ হয় ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক-একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক কিংবা বিচক্ষণ মনোবিদ্ নন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি ভালবাসেন না? ভাল তাঁহারাও বাসেন, আমিও বাসি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমাদের সকলেরই কিছু কিছু অধিকার আছে—নয় কি?

যাক, এখন আলোচনা আরম্ভ করা যাক। প্রথমেই দেখি ভালবাসা কথাটা কত রকম অর্থে ব্যবহার হয়। হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া হিমালয়ের স্থির ধীর মহিমময় মূর্তি দেখিতে, পুরীতে সমুদ্রের ধারে বসিয়া তরঙ্গের অবিরাম নৃত্যলীলা দেখিতে আমি খুব ভালবাসি। রেলগাড়িতে চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইয়া বেড়াইতে আমি ভালবাসি। (মাসে একটা করিয়া কলিশন হইবার পর হইতে এই ভালবাসাটা যেন আজকাল একটু কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।) পাইপে আমেরিকান তামাক, বর্ম্মা চুরুট, বেল জুঁই হাস্নুহানার গন্ধ, সেন মহাশয়ের কড়াপাকের সন্দেশ, উমাপদ দত্তের খেয়াল গান, আড্ডায় বিমল-ক্ষেত্র-মতিলালের রসের কথা, টীকা-টিপ্পনী, 'শনিবারের চিঠি'র "প্রসঙ্গ কথা", statistics-এর অঙ্ক, রবিবাবুর বর্ষার কবিতা—এ সমস্ত যেমন ভালবাসি, আমার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, ছোট ভাই বোন, বন্ধুবান্ধব, বান্ধবী—ইহাদেরও তেমনই ভালবাসি। পাঠক-পাঠিকাদেরও ভালবাসার এই ধরনের নানা রকম বস্তু ও পাত্রী এবং পাত্র আছে। ভালবাসার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে কি প্রথমে এই রকম একটি তালিকা তৈয়ারি করিয়া তাহার পর কোন একটি বিশেষ পদার্থ বা গুণ তালিকাভুক্ত সমস্ত জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান আছে কি না, তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে? তাহা কি সম্ভব? আর

যদি সম্ভবই হয়, তাহা হইলেই কি ব্যাপারটির চরম মীমাংসা হইয়া যাইবে? প্রাণহীন বস্তু আর জীবন্ত মানুষ কি একই কারণে আমাদের ভালবাসা আকর্ষণ করে? কালো রঙ ভালবাসে বলিয়া যে লোক আসবাবপত্র সব কালো পালিশ করাইয়া লয়, সে কি শ্যামবর্ণা স্ত্রী না হইলে ভালবাসিতে পারিবে না?

বন্ধু বলিলেন, আমি দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু মিশাইয়া ফেলিয়া গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছি। জিনিসগুলা আমাদের ভাল লাগে, আর মানুষকে আমরা ভালবাসি। ঠিক মানিয়া লইতে পারিলাম না যে, ভাল লাগা আর ভালবাসা দুইটা বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে কি আমার ভাল লাগে না? যাহা ভাল লাগে, তাহা কি আমি ভালবাসি না? ভাল লাগে অথচ ভালবাসি না, কিংবা ভালবাসি অথচ ভাল লাগে না—এমন দৃষ্টান্ত আছে কি? তাহা ছাড়া বাড়ির গরুটা? খুকীর পোষা বিড়ালটা? টম কুকুরটা? তাহারা কোন্ শ্রেণীর ভিতর পড়িবে? ভাল লাগার, না ভালবাসার?

যাহাই হউক, উপস্থিত আমাদের অনুসন্ধান মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা যাউক। এমন তো হইতে পারে যে, মানুষের পরস্পরের ভালবাসার রূপ, কারণ প্রভৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া এমন একটা কিছুর সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহার সাহায্যে পরে বস্তুবিশেষের প্রতি আমাদের আকর্ষণের হেতু বোঝা সহজ হইয়া পড়িবে।

ভালবাসার পরিচয় কিসে পাওয়া যায়? একটা প্রধান লক্ষণ—সহানুভূতি। আমি শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরীকে (উহা আমার স্ত্রীর নাম, বড় সেকেলে, কিন্তু উপায় তো নাই) ভালবাসি বলিয়াই তো তিনি বাতের ব্যথায় যখন কষ্ট পান, তখন তাঁহার আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিই, ওরিয়েণ্টাল বাম মালিশ করি।

মালিশ করিয়া যেন আমারই কষ্ট কমিয়া গেল মনে হয়, আর তিনি যখন একটু আরাম বোধ করেন, আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। গদাধর যাহাকে ভালবাসে, তাহার দুঃখ-কষ্ট সুখ-আনন্দ সবই গদাধর তাহার নিজের বলিয়াই মনে করে। আমরা সকলেই তাই করিয়া থাকি। ভালবাসা থাকিলেই সহানুভূতি আছে ধরিয়া লওয়া যায়; কিন্তু উল্টাটা কি সব সময় ঠিক হয়? সহানুভূতি থাকিলেই ভালবাসা আছে—মনে করা চলে কি? আমার তো মনে হয় না।

সহানুভূতি জিনিসটা একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার ভিত্তি হইতেছে একাত্মবোধ—এক হইয়া যাওয়া, যাহাকে ইংরেজীতে বলে, Identification। যাহার প্রতি সহানুভূতি করিতেছি, তাহার মনের সঙ্গে নিজের মন খানিকটা এক হইয়া যায়। সেইজন্যই তো তাহার দুঃখ নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতে পারি। ধরুন, তাহার মনের সঙ্গে নিজের মন একেবারে এক হইয়া গেল। সাধারণত সকলের বিশ্বাস, ওই রকম নিবিড়ভাবে এক হইয়া যাওয়াই চরম ভালবাসার লক্ষণ। যখন তাহার প্রত্যেক ভাবটি নিজের বলিয়া অনুভব করিতে পারিব, তখনই তাহার প্রতি ভালবাসার আমার শেষ পরিণতি হইবে। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। একেবারে এক হইয়া গেলে ভালবাসা বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না। দ্বৈতভাব একটু না থাকিলে ভালবাসা কথাটার কোন অর্থই থাকে না। একেবারে মিশিয়া যাওয়া—ভালবাসার অতীত কোন অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু ভালবাসার অবস্থা নয়। সহানুভূতি, পরোপকার, আত্মত্যাগ—এই কথাগুলা যথাযথভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যাইবে যে, পূর্ণভাবে এক হইয়া গেলে কথাগুলা একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। আপনি পরের দুঃখ উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও তো

করিতেছেন। আপনার মনের এক অংশ দিয়া আপনি আমার দুঃখ বুঝিতেছেন, আপনার মনের সেই অংশটা আমার মনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আপনার মনের যে অংশ দুঃখ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, সে অংশটা তো স্বতন্ত্র আছে। যদি পুরাপুরিভাবে আপনার সব মনটাই আমার মনের সঙ্গে এক হইয়া যাইত, তাহা হইলে তো আপনি শুধু দুঃখই অনুভব করিতেন, উপকারের প্রবৃত্তি আপনার আসিত কোথা হইতে? বৈষ্ণব কবিরা বলেন, রাধা যখন কৃষ্ণের সহিত এক হইয়া গেলেন, তখন "কোথায় রাধা কোথায় রাধা" করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আত্মত্যাগ, ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীর জন্য নিজের সুখ, ভবিষ্যৎ, নাম, যশ, অর্থ, ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত না করা—ভালবাসার একটি মহৎ লক্ষণ। কিন্তু আপনি এইসব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন কখন? যখন জানেন যে, আপনার ভালবাসার পাত্র একটি প্রাণহীন জড়বস্তু নয়, হৃদয়হীন পুরুষ বা হৃদয়হীনা নারী নয়। অর্থাৎ যখন জানেন যে, যাহার জন্য এই ত্যাগ, সে এই ত্যাগের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে, ইহার দাম দিতে জানে। আরও একটু ভাবিয়া দেখুন, তাহার মানে এই, যখন আপনি বোঝেন যে, তাহার মনও খানিকটা আপনার মনের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে। দেশের জন্য ত্যাগের বেলায়ও এ কথা খাটে। দেশ মানে তখন শুধু দেশের মাটিটা নয়, দেশের লোকজন, যাহাদের আপনি ভাই বোন আত্মীয় বলিয়া মনে করেন, তাহাদের জন্যই ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। আমার মনটা যদি একেবারে শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরীর মত হইত কিংবা তাঁহার মনের গঠন যদি ঠিক আমারই মত হইত, তাহা হইলে যে কি অশান্তির সংসার হইত, ভাবিতেও আমার ভয় হয়। দুইটি একই ধরনের

বিদ্যুৎশক্তি পরস্পরকে প্রতিরোধ করে, বিপরীতগুণসম্পন্ন আকর্ষণ করে। এটা অবশ্য উপমা। মানুষের ভালবাসার ক্ষেত্রে এ উপমা হয়তো সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত নয়। যদি দুইজনের মনের ধারা একেবারে বিপরীতভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ যদি একাত্মবোধের সম্ভাবনা এতটুকুও না থাকে, তাহা হইলে কি তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হয়? [গদাধর নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তাহার খানিকটা মন ক্ষান্তমণির মনের মত করিয়া তুলিবে, আবার ক্ষান্তমণিও তাহার মনের ধরনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট না করিয়া খানিকটা গদাধরের মত হইবার চেষ্টা করিবে, তবেই তো দুইজনের মধ্যে ভালবাসা গাঢ় হইয়া উঠিবে।]

আজকাল নব্য সমাজে একটা রব উঠিয়াছে, আর হৈ-চৈ করিয়া সেটাকে বজায় রাখিবার খুব চেষ্টা চলিতেছে যে, লেখাপড়া-জানা (অর্থাৎ পাস-করা) 'কনে' না হইলে নাকি পাস-করা 'বরে'র মনের মিল হয় না। সেইজন্য বরেরা পাস-করা কনে না হইলে বিবাহ করিতে রাজি হইতেছেন না। কিন্তু এ আন্দোলন সম্পূর্ণ কৃত্রিম। একাত্মবোধের সম্ভাবনা থাকিলেই মনের মিল হইবে। বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়া মিল হইলেই যে একাত্মবোধ খুব সহজ হইয়া পড়িবে, মনোবিদ্‌রা কি বলিবেন জানি না, আমার তো তাহা মনে হয় না। যে কনে ইংরেজীতে খুব ভাল করিয়া এম. এ. পাস করিয়াছেন, তিনি কি কোন দাড়িওয়ালা বিখ্যাত ইংরেজী ভাষার অধ্যাপককে বিবাহ করতে রাজি হইবেন? বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের মনের সামান্য একটি অংশমাত্র। দৈনন্দিন কাজে বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা অন্য সব বৃত্তির দ্বারাই চালিত হই আমরা বেশি। কথাটা হয়তো বুদ্ধিবাদীদের ভাল লাগিবে না। কিন্তু তাঁহাদের আমি অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদের ছোট পড়িবার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া একবার তাঁহাদের পরিবারবর্গের, বন্ধুবান্ধবদের, সাধারণ লোকদের

ব্যবহারগুলা একটু ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করুন, তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কথাটা আমি একেবারে বাজে বলি নাই। ভাবের দিক দিয়া একাত্মবোধ হওয়া যত সহজ, বুদ্ধির দিক হইতে তত সহজ নয়। শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরীর লেখাপড়া বিষয়ে, একজন যেমন বর্ণনা করিয়াছিলেন, উদিকে বড় উ লেই, কিন্তু তা হ'লে কি হয়, পোস্ত খাওয়া বিষয়ে—(নাঃ, ঘরের কথা অত বলিয়া কাজ নাই !)

আদর্শ ভালবাসার কথা বলিতে গিয়া অনেকেই ভাবে গদগদ হইয়া পৃথিবী ছাড়িয়া অনেকে উঁচুতে উঠিয়া যান এবং কল্পনায় প্রেমের যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহারা তৈয়ারি করেন, তাহার ভিত্তিতে থাকে খুব দামী দামী মানসিক বৃত্তি, যেমন পরিপূর্ণ মনের মিল, ভক্তি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি ; আরও থাকে অনন্ত সময়—চিরকাল। সেখানে দেহ সম্বন্ধে কোন কথার কল্পনা করা একেবারে নিষিদ্ধ, অভব্য, পাপ। কিন্তু যাহা বলিয়াছি, ও অট্টালিকার স্থান ঐ কল্পনারাজ্যেই আমাদের এই বাস্তব জগতে নয়। [বাস্তব জগতে দেবী 'ক্ষুধা'রূপেও অবস্থান করেন সে রূপেও তাঁহার তুষ্টিসাধন প্রয়োজন। শারীরিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে ভালবাসার একটি অঙ্গ নয়, সে ভালবাসা কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, আদর্শ হওয়া তো দূরের কথা। অনেক সময় হয়তো সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হয়, সংসারে থাকিতে গেলে অনেক আকাঙ্ক্ষাই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শ ভালবাসার কল্পনা হইতে এই দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিতে হইবে, এটা একেবারেই ঠিক নয়।] রাধাকৃষ্ণের আদর্শ প্রেম বর্ণনা করিয়া যেসব পদাবলী রচিত হইয়াছে, দৈহিক ভালবাসার কথা বাদ দিলে সেগুলি কি নীরস হইয়া পড়িত না ? তাহাদের এত প্রভাব তাহা হইলে কি আজ পর্য্যন্ত থাকিত ? আমি বুঝিতে পারিতেছি, সকলে, বিশেষত পাঠিকারা এবং

কবিভাবাপন্ন সদ্য-ভালবাসাগ্রস্ত তরুণ পাঠকবর্গ, কথাটায় সায় দিতেছেন না। পাঠিকারা বলিবেন, কেন আয়েষার ভালবাসা? প্রথম কথা, আয়েষা একটি কল্পনা। সশরীরী আয়েষার দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা হয় কি না এবং সে আকাঙ্ক্ষা ঘটনাচক্রে চাপা পড়ে কি না, সেটা একটি বিবেচনার বিষয়; দ্বিতীয়ত, শুধু ভালবাসা নামক মনোবৃত্তির দিক হইতে বিচার করিলে আয়েষার এ ভালবাসা সম্পূর্ণ বা আদর্শ ভালবাসা বলিতে পারা যায় না, সমাজের চলিত ব্যবহারের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া আপনারা যাহাই বলুন। নিজে আম খাইয়া যে আনন্দ পাই, আর একজন আম খাইতেছে দেখিয়া যে আনন্দ পাই, এ দুইটি আনন্দ কি এক রকম? 'আম খাইয়া আনন্দ'—এই যদি বিচার্য্য বিষয় হয়, তবে কোন্‌টিকে বেশি পরিপূর্ণ বলিবেন? আর তরুণদের আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, মানসী প্রিয়ার রূপ কল্পনা করা কি তাঁহাদের কবিতার একটি প্রধান উৎস নয়? সত্যই যদি কোন ভালবাসার পাত্রী তাঁহাদের থাকেন, তবে সেই পাত্রীটিকে দেখিবার, তাঁহার সহিত কথা কহিবার বাসনা কি তাঁহাদের হয় না? স্বয়ং ভগবানকেও ভাল করিয়া ভালবাসিবার জন্য যে আমরা তাঁহার নানা রকম রূপের কল্পনা করি। (তাহা হইতেই কি তথাকথিত পৌত্তলিকতার অভ্যুদয়?) যাঁহারা কোন মূর্ত্ত রূপের ভিতর দিয়া ভগবানকে দেখিতে চান না, তাঁহারাও তো বলেন, "প্রতিমা দিয়ে পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমারই প্রতিমা"। কবিরা যে জিনিসটিকে খুব হালকা করিয়া জলে গুলিয়া অশরীরী কল্পনায় পরিণত করেন, সাধারণ লোকে তাহাকেই পরিপূর্ণ অবস্থায় স্থূলরূপে পাইতে চায়। ইহাতে ভালবাসার মর্য্যাদার হানি কিছুমাত্র তো হয়ই না, বরং এই শারীরিক আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে ভালবাসার সুষ্ঠ বিকাশই হয় না।

ভালবাসা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা গেল। তাও বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে গুছাইয়া বলিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করা হয় নাই। ভালবাসার সঙ্গে এক দিকে যেমন হিংসা, অন্য দিকে তেমনই ঘৃণার বেশ যোগাযোগ আছে। ভালবাসা কি শুধুই মনের একটা ভাব, না আর কিছু? ভালবাসার গভীরত্ব বিচার করিবার কি কোন মাপকাঠি পাওয়া যায়? পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির ভালবাসা প্রকাশের ধারার বিভিন্নতা কি?—এই ধরনের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন আছে।

শ্রাবণ, ১৩৪৬

সাহিত্য ও মনোবিদ্যা

সাহিত্য যে দেশের ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আপনাকে গড়িয়া তোলে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির বৈচিত্র্য যে মানব-মনেরই বিচিত্রতার প্রকাশক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অস্বীকার না করিলেও কথাটা মোটামুটিভাবেই সাধারণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া রচনার বিষয়, ভাষা, ছন্দ, প্রণালী প্রভৃতির ভিতর দিয়া রচয়িতার মনের কোন্ ভাবধারা, কোন্ চিন্তাধারা আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়, মনোবিদ্যার সাহায্য লইতে হয়।

মনোজগতের নিগূঢ় রহস্যের খবর সম্প্রতি সাধারণেও পাইতেছে। এই রহস্য উদ্ঘাটন করেন প্রথম ডাক্তার সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড। তাঁহার নবাবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণ-প্রণালীর দ্বারা একদিকে মানসিক বিকারের যেমন প্রতিকার করা যায়, অন্য দিকে স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলির কার্য্য-ধারারও একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্বপ্ন যে নিরর্থক নয়, কল্পনা আকাশের যত উচ্চস্তরেই বিচরণ করুক না, তাহার সূত্রপাত যে এই মাটির পৃথিবীতেই ফ্রয়েড তাহা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু স্বপ্নের অর্থ, কল্পনার ভিত্তি মনের উপর ভাসিয়া বেড়ায় না, তাহাদের বাসস্থান মনের গভীরতম প্রদেশে, তাই তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। মনের এমন একটি স্তর আছে, যাহার

অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সজ্ঞান নহি। আমাদের অনেক কার্য্যধারার অনেক ভাবরাশির, অনেক চিন্তাস্রোতের প্রেরণা আসে মনের সেই নির্জ্ঞান স্তর হইতে।

যেখানেই মন সৃষ্টির আনন্দে বিভোর—কাব্যে, গল্পে, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সেখানেই এই নির্জ্ঞান মন ব্যক্ত করে আপনাকে, বিষয় নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া, ভাষার, ভঙ্গিমায়, বর্ণের সমাবেশে, স্থাপত্যের কৌশলে। স্বপ্ন যেমন অবদমিত ইচ্ছার পরিপূর্ত্তিমাত্র, কল্পনাও তেমনই দৈনন্দিন ঘটনার অবদমিত-ইচ্ছানুযায়ী বিকারমাত্র।

মন চায় আপনার মধ্যে আপনি লুকাইয়া শান্তিতে থাকিতে, জগৎ সে সুখ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে। আপনাকে মনের উপর প্রতিফলিত করিয়া তাহার নিকট হইতে প্রতিক্রিয়া চায়—জগৎ। তাই এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। সে দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য মনের নানাবিধ চেষ্টা হইতেই নানাবিধ মানসিক সৃষ্টির লীলা। সাহিত্য সেই সৃষ্টিলীলারই একরূপ বিকাশ।

আবার মন চায় আপনাকে অনন্তে বিস্তার করিয়া আকাশ, ভুবন, চরাচর ছাইয়া ফেলিতে, জগৎ দেয় বাধা। তাই এই দ্বন্দ্ব। এই বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে বিস্তার করিবার মনের নানাবিধ চেষ্টাই নানাবিধ মানসিক সৃষ্টির লীলা।

মনের ও জগতের এই ঘাত-প্রতিঘাতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন ফ্রয়েড। সাহিত্য প্রভৃতিতে এই ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গ দেখিতে পাই—ব্যাখ্যা পাই না। ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের কাজ। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূলসূত্রগুলি এখন সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তাই আশা করি, শীঘ্রই কোনও মনোবিজ্ঞান-অভিজ্ঞ সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের ধারা আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন যে,

তাহার ক্রমোন্নতি মনোবিকাশের নবাবিষ্কৃত ধারা অনুযায়ীই হইয়া আসিয়াছে।

কল্পনাই সাহিত্য-স্থষ্টির মূল কথা। কল্পনার বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য দান করে। কিন্তু সাহিত্য-স্থষ্টির বিশেষত্ব কি ?

দৈনন্দিন জীবনে সকলকেই তো কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাই প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাকে পরমুহূর্ত্তে কি ঘটিবে, ভাবিয়া লইতে হয়। বণিক ভবিষ্যৎ লাভালাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অর্থের উপস্থিত ব্যবহারের বিষয়ে যত্নবান হয়। যুবক তাহার এখনও-অদৃষ্ট প্রণয়িনীর চিত্রে কল্পনার রঙ ফলায়। কর্ম্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যখনই কেহ কোন কার্য্য করে, তখনই তাহাকে কল্পনার শরণাপন্ন হইতে হয়। তবে এই ধরনের কল্পনার খেলা আর সাহিত্যে কল্পনার স্থষ্টি, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?

প্রভেদ এই যে, একটির প্রেরণা আসে বাহিরের প্রয়োজন হইতে, অন্যটির তাহা নহে। তাই প্রথমটিকে চলিতে হয় বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, স্থান-কাল-পাত্রের সীমার গণ্ডির ভিতর আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া। কিন্তু সাহিত্যে যাহার সহিত আমাদের পরিচয়, সেই দ্বিতীয়টির কোন বন্ধনই নাই, কোন সাংসারিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য তাহার নাই; তাই সে মুক্ত, সে স্বাধীন। স্থান কাল পাত্র তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে স্বর্গে ইন্দ্রসভায় উপস্থিত হইয়া উর্ব্বশীর গান শুনিয়া আনন্দে অধীর হয়। আবার দান্তের সহিত নরকের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নানা বিভীষিকা দর্শনে ভয়ে আত্মহারা হইয়া পড়ে।

সাধারণভাবে দেখিলে এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই সাহিত্যিক কল্পনার বিশেষত্ব বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে। কিন্তু মনোবিদ্‌রা বলেন,

কার্য্যকারণ-বিধি অন্য ক্ষেত্রের ন্যায় মনোরাজ্যেও সমানভাবেই কার্য্য করে। সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মানসক্ষেত্রেও নাই। সাহিত্যিক কল্পনাও একেবারে স্বাধীন হইতে পারে না। তবে স্বাধীন বলি এইজন্য যে, সেই কল্পনারাশির বন্ধনসূত্রগুলি আমাদের সংজ্ঞানে না থাকায় তাহাদের কার্য্যকারণ-ধারা আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। নির্জ্ঞানের অন্তরে তাহাদের কারণসমূহ লুক্কায়িত থাকে বলিয়া মনে হয় যে, তাহারা স্বয়ম্ভু। আপনা-আপনি airy nothing হইতে রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশমান হইয়াছে।

কিন্তু স্বাধীন যদি না হইল তবে কি সে নিয়ম, যাহা এই কল্পনার যথেচ্ছ বিহারকে নিয়ন্ত্রিত করে? কোন্ দেবতা তিনি, যিনি এই কল্পনার ধারাকে আপন মনোমত পথে চালাইয়া তাঁহার প্রাপ্য অর্ঘ্য আদায় করিয়া লন? সেই দেবতা রচয়িতার নির্জ্ঞান মন, এবং সে নিয়ম নির্জ্ঞান মনের কার্য্যধারার নিয়ম। সেই নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন বিশিষ্ট মনোবিদ্‌গণ।

কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষার ফলে তাহার কতকগুলি সংজ্ঞান হইতে বিতাড়িত হইয়া নির্জ্ঞানে প্রেরিত হয়। মনের গোচরীভূত অংশটুকু সংজ্ঞান (conscious), এবং বিশাল অগোচর অংশটি নির্জ্ঞান (unconscious)। নির্জ্ঞানের মধ্যে এই অপসরণ, প্রবৃত্তিগুলি নীরবে সহ্য করে না। পূর্ব্বাধিকৃত স্থান পুনর্ব্বার অধিকার করিবার অশ্রান্ত প্রয়াস তাহারা করে। তাই সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বই হইল কল্পনার মূল। নির্জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা যখন সহজভাবে বাস্তব জগতে মিটাইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন সে ছদ্মবেশে কল্পনার সাহায্যে আপনার দাবি পূর্ণভাবে আদায় করিয়া লয়। ইহা প্রমাণসাপেক্ষ

স্বীকার করি। কিন্তু এ বিষয়েও সংশয় রাখিবার কোন কারণ নাই, যে কোন একজন কবির রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, কবির সমস্ত কল্পনাই তাঁহার বাস্তব জীবনের ব্যর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থ বাসনারাশির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

আষাঢ়, ১৩৪০

মনোবিদ্যার প্রয়োগ

মনোবিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমে মনোবিদ্যা বিষয়টা কি, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। অবশ্য আজকাল শিক্ষিত সমাজে কথাটার খুব প্রচলন হয়ে গেছে এবং সকলেরই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানা আছে, তবে একটা কথা গোড়াতেই বলা উচিত ব'লে মনে করি। আমি কথাবার্ত্তা ক'রে আলাপ-আলোচনা ক'রে দেখেছি যে, অনেকেরই ধারণা আধুনিক মনোবিদ্যা মানেই ফ্রয়েড, আর ফ্রয়েড মানেই কামজীবন সংক্রান্ত কোন ব্যাপার, সুতরাং তাঁদের মতে মনোবিদ্যা মানে মানুষের কামজীবনের চর্চ্চা করা। অবশ্য মানুষের কামজীবনের চর্চ্চা করা মনোবিদ্যার একটা কাজ বটে, একটা বড় কাজ; কিন্তু তাই ব'লে ওইটেই ওর একমাত্র কাজ এটা ধারণা করা একেবারেই সঙ্গত নয়। কামপ্রবৃত্তি ছাড়া মানুষের আরও অনেক প্রবৃত্তি আছে, মনের আরও অনেক গুণাগুণ আছে, যে সম্বন্ধে আলোচনা করাও মনোবিদ্যার কাজ। সুতরাং সাধারণ ধারণা আংশিকভাবে সত্য হ'লেও সম্পূর্ণ সত্য নয়, এ কথাটা মনে রাখা উচিত। মনোবিদ্যার চর্চ্চা পাশ্চাত্য দেশে এবং আমাদের দেশেও বহু পুরাকাল থেকে চ'লে আসছে। সেই আদিম যুগে মানুষের মনে কৌতূহল-প্রবৃত্তি যেদিন প্রথম জেগেছিল, সেদিন থেকেই তারা সব বিষয়ে জানাবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সব ঘটনার অভিজ্ঞতা তাদের হ'ত বা যে সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারের সংস্পর্শে তারা আসত, তাদের সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন—যেমন 'কি' 'কেন' 'কেমন ক'রে'—তারা উত্থাপন করত এবং একটা না একটা জবাবও ঠিক ক'রে নিত।

আপনারা জানেন যে, এই সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতিকে তারা এক-জাতীয় বিরাট মানুষের মতই কল্পনা করত এবং তাদের নিজেদের মনোবৃত্তি সব গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর আরোপ ক'রে নৈসর্গিক ব্যাপারগুলির একটা ব্যাখ্যা ক'রে নিত। সূর্য্য তাঁর সাত ঘোড়ার রথে চ'ড়ে তাঁর রাজ্য পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন—রাহু নামে একজন অপদেবতা চাঁদকে রাগ ক'রে গ্রাস ক'রে ফেললেন, এই ধরনের ব্যাখ্যা তারা যথেষ্ট ব'লে মনে করত, আর এইতেই তারা সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনা-গুলির মধ্যে একটা ঘটনা তাদের অত্যন্ত বিচলিত ক'রে তুলত, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে ফেলত; সেই ঘটনার কাছে তাদের সমস্ত মনোবৃত্তি যেন পরাজিত হয়ে যেত। সেই ঘটনাটি হচ্ছে মৃত্যু—এ কি গভীর রহস্য! এইমাত্র যে লোকটি কথাবার্ত্তা কইছিল, তীর ধনুক নিয়ে জন্তু-জানোয়ার শিকার ক'রে বেড়াচ্ছিল, শত্রুকে আক্রমণ করছিল, তার এ কি হ'ল? সে এমন অসাড় হয়ে অসহায় অবস্থায় প'ড়ে রইল কেন? একটা অজানা ভয়ে তাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। ভয় যখন একটু কমল, তখনই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হ'ল। নিশ্চয়ই ওই শরীরের মধ্যে অশরীরী কিছু ছিল, যে দেহ ছেড়ে চ'লে গেছে, সেই অশরীরী শক্তিই তা হ'লে মানুষকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, মানুষকে দিয়ে সব কাজ করায়। সে ইচ্ছামত দেহ ছেড়েও বিচরণ ক'রে বেড়াতে পারে। পাছে সে অন্য লোকের দেহে প্রবেশ ক'রে তার কিছু ক্ষতি করে, তার জন্য তাকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার। তখন থেকে গ'ড়ে উঠল —সেই অশরীরী আত্মাই বলুন, মনই বলুন—তাকে সন্তুষ্ট রাখবার নানা রকম প্রথা। আমরা সেই আদিম যুগ থেকে অনেক দূরে স'রে এসেছি। কিন্তু সেই আদিমকালের মনোবৃত্তি কি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পেরেছি? মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে এখনও কি আমাদের মনে একটু ভয় ও বিস্ময়ের

সঞ্চার হয় না? শ্মশানবৈরাগ্য কি ক্ষণকালের জন্যও আমাদের বিচলিত করে না? তা ছাড়া আমাদের অশৌচাদি, শ্রাদ্ধ, শান্তি প্রভৃতির যে সব নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা নিয়ম-কানুন আছে, সেগুলি কি সেই মনোভাবপ্রসূতই নয়? আপনারা অবশ্য মনে করবেন না যে, এই প্রথাগুলি থাকা উচিত কি না, কিংবা এগুলি ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে আমি বিচার করতে বসেছি। বিচার করতে যাওয়া আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছিলুম যে, আজকালকার এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ সেই আদিমকালের অসভ্য মানুষের সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজেদের যতই সভ্য বা উন্নত মনে করুন না কেন, মৃত্যুর কাছে দাঁড়ালে তাঁদের মনেও, অন্তত বেশির ভাগ লোকের মনেই, সেই আদিম মনোবৃত্তি এখনও জাগে। যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সেই অশরীরী শক্তির সম্বন্ধে আলোচনা থেকেই হ'ল মনোবিদ্যার জন্মলাভ। এই অশরীরী মনের শক্তিসামর্থ্য কার্য্যকলাপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা থেকেই মনোবিদ্যার সূত্রপাত। আর একটি ঘটনা এই অশরীরী মনের কল্পনাকে অনেক দৃঢ় করেছিল। সেটা হচ্ছে স্বপ্ন। যে লোক উপস্থিত নেই তাকে আবার দেখা যায়, যে লোক মৃত তাকে আবার স্পর্শ করা যায়, সে আবার কথা কয়, এ কি ক'রে সম্ভব হয়, যদি না মনের শরীর ছেড়ে বিচরণ করবার ক্ষমতা থাকত! তাই আমরা দেখতে পাই, সে যুগের মনোবিদ্যা অশরীরী মন নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তারপর ক্রমশ যখন সভ্যতার বিকাশ হতে লাগল, মনোবিদ্যার ধারারও পরিবর্ত্তন হ'ল। Aristotle প্রভৃতি গ্রীক মনীষীগণ বললেন যে, মন অশরীরী বটে, কিন্তু শরীরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই তা নয়, বরং শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ তার খুবই ঘনিষ্ঠ। Aristotle একটা উপমা দিয়ে এই সম্বন্ধটি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। দেহ আর মন কি

রকম জানেন? যেমন চোখ আর দৃষ্টিশক্তি। চোখই দৃষ্টিশক্তি নয়, এবং দৃষ্টিশক্তিই চোখ নয়, কিন্তু চোখ ভিন্ন দৃষ্টিশক্তির কল্পনা করা যায় না। দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে হ'লে চোখ সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার, সেই রকম মন সম্বন্ধেও জানতে হ'লে শরীর সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান লাভ করা দরকার। তখন থেকে মনোবিদ্যা এই শরীরী মনের চর্চ্চা আরম্ভ করল। কিন্তু ক্রমশই এই শরীরী মনের চর্চ্চা এত ভীষণভাবে হতে লাগল যে, মনটা যে শরীর ছাড়া আর কিছু, সে কথা লোকে ভুলে যেতে বসল। (কয়েকজন মনোবিদ্ আজকাল এই ধারণাটা আবার চালাবার চেষ্টা করছেন।) ক্রমে মনটাই শরীর—এই ধারণা এমন বদ্ধমূল হয়ে উঠল যে, সমাজে নানা রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে লাগল। শরীরের সুখই মনের সুখ, শরীরের চর্চ্চাই মনের চর্চ্চা—এই ধারণা থেকে অনেক রকম দুর্নীতি সমাজে প্রশ্রয় পেতে লাগল। সমাজের এই দুর্গতি যখন চরম অবস্থায় উঠল, তখন আর একজন দার্শনিকের অভ্যুদয় হ'ল, যিনি শরীর আর মনকে আবার জোর ক'রে আলাদা ক'রে দিলেন। তাঁর নাম Descartes। তিনি বললেন, শরীর আর মন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। মনোবিদ্যার কাজ হচ্ছে শরীর সম্বন্ধে আলোচনা করা নয়—মনোবৃত্তি, যেমন চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা। যাঁরা ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চা করতেন এবং সব প্রশ্ন ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে বিচার করতেন, তাঁদের কাছে এই মত খুব যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল। নীতিশাস্ত্রবিদেরা এইমত সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু যখন মনোবিদ্‌রা এই ধারণা নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, তাঁরা পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন। চিন্তাশক্তি মনোবিদ্যার চর্চ্চার বিষয় ঠিকই, কিন্তু সে চিন্তা কার এবং কি বিষয়ে? একটা অশরীরী চিন্তাশক্তি তো

আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় না? দেহের ভিতর দিয়েই তো চিন্তাশক্তির প্রকাশ হয়, কাজেই দেহ বাদ দিয়ে মানুষের চিন্তাশক্তির চর্চ্চা কি ক'রে সম্ভব? সব রকম মনোবৃত্তির সন্ধান আমরা দেহের ভিতর দিয়েই পাই, কাজেই দেহকে বাদ দিয়ে মনের চর্চ্চা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া চিন্তার বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করতে গেলেও মনের বাইরের জিনিসের দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়; সুতরাং এ কথাই বলা উচিত যে, মানুষের অভিজ্ঞতাই মনোবিদ্যার আলোচনার বিষয়। এই ধারণাই এখন সকলে সমীচীন ব'লে মনে করেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই আমাদের মনের উপর রেখাপাত করতে পারে, সুতরাং এক দিক দিয়ে দেখলে সব-কিছুই মনোবিদ্যার চর্চ্চার বিষয় হতে পারে। তবে পদার্থবিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার তফাত এই যে, অন্যান্য জিনিসগুলি মনের উপর কি রকম রেখাপাত করল, সেইটি অধ্যয়ন করাই মনোবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য; আর মনের উপর রেখাপাতের দিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়ে শুধু জিনিসগুলি সম্বন্ধেই চর্চ্চা করা পদার্থবিদ্যার কাজ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমস্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তর এনে দিলেন **Darwin** তাঁর 'বিবর্ত্তনবাদ' প্রচার ক'রে। যে কোন বিষয় সম্বন্ধেই আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করতে চাই, সেই বিষয়টির শুধু বর্ত্তমান অবস্থাটাই দৃষ্টির মধ্যে না রেখে, সেটি কি রকম ভাবে ক্রমশ গ'ড়ে উঠেছে, সেটা বোঝবার চেষ্টা করলে বিষয়টির বর্ত্তমান অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। তখন থেকে সব বিষয়েরই 'ক্রমবিবর্ত্তন' অধ্যয়ন করা বৈজ্ঞানিক আলোচনার একটি প্রধান উপায় ব'লে গণ্য হ'ল। আমাদের মনোবিদ্যাও এই মতবাদের প্রভাব থেকে দূরে রইল না। পরিণত বয়সের যে কোন মনোবৃত্তি অধ্যয়ন করতে হ'লে সেই বৃত্তিটির কি রকম ভাবে ক্রমশ বিকাশ হয়েছে,

শিশুর মনে সেই বৃত্তিটি কিরূপ ভাবে প্রকাশ পেত, সে আলোচনা করাও প্রয়োজন ব'লে মনোবিদ্‌রা অনুভব করলেন। শিশুদের মন অধ্যয়ন করবার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। শিশুমন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সকলে স্বীকার করতে লাগলেন। শিশুদের মানসিক গঠন কি রকম, কি কি প্রবৃত্তি নিয়ে তারা জন্মায়, কোন্ প্রবৃত্তির পর কোন্ প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, শিশুদের চিন্তাধারা, বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবরাজ্য কি রকম, শিশুদের পরস্পরের মধ্যে মনের পার্থক্য কোথায়—এই সব বিষয়ের অনুসন্ধান হতে লাগল।

তারপর মনোবিদ্যার চর্চ্চার ইতিহাসে আর এক যুগান্তর নিয়ে এলেন Wilhelm Wundt। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যেদিন তিনি Leipzig বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে মনোবিদ্যা চর্চ্চার জন্য প্রথম প্রয়োগশালা (laboratory) স্থাপন করলেন, সে এক চিরস্মরণীয় দিন। তিনি দেখলেন, অন্য সমস্ত পদার্থবিদ্যা যে উপায় অবলম্বন ক'রে এত দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে, মনোবিদ্যা-চর্চ্চার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। কোন একটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানুষের মন কি রকম ভাবে কাজ করে, কি চিন্তা তার মনে আসে, কি ভাব তার মনে জাগে, তার অনেক কিছুই যে সঠিকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, নানা রকম পরীক্ষার দ্বারা তিনি তা প্রমাণ করলেন। অন্যান্য তত্ত্বের মধ্যে দেখা গেল, মনের কার্য্য-কলাপের কতকগুলি ধারা সকলের মনের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হ'লেও প্রত্যেক মানুষেরই মানসিক গঠনের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। Wundt-এর laboratory-তে যে সমস্ত বিদেশী ছাত্রের সমাগম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত আমেরিকাবাসীরা, এই মানসিক বিভিন্নতাটি বিশেষভাবে অধ্যয়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

বিভিন্নতার শুধু রূপনির্ণয় নয়, বিভিন্নতার পরিমাণ কতখানি, কি উপায় অবলম্বন করলে সেটার পরিমাপ ঠিক করা যায়, তাই উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নানা রকম test-এর সৃষ্টি হ'ল—এই সৃষ্টিকার্য্য এখনও পুরাদমে চলছে। জ্ঞানের প্রসারতা আমাদের যত বাড়ছে, পরিমাপের মানদণ্ড ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হচ্ছে। Wundt-এর পন্থা অবলম্বন ক'রে অনেক পুরানো সমস্যার যেমন সমাধান হ'ল, তেমনই আবার অনেক নতুন সমস্যারও উদ্ভব হ'ল। আধুনিক মনোবিদ্‌রা এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে এখনও ব্যস্ত রয়েছেন।

এই তো গেল এক দিককার কথা। অন্য দিকে আর একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মন সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার করলেন। Sigmund Freud চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ ক'রে তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হলেন যে, মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে চিকিৎসকদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প এবং চিকিৎসা করবার প্রণালীগুলিও কার্য্যকরী একেবারেই নয়। সেই আদিম যুগের মানুষের মত তাঁরও অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি জেগে উঠল। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে সমস্ত গভীর তত্ত্বের আবিষ্কার করলেন, তাতে আমাদের মন সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। নির্জ্জান মন ও তার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে সব তথ্যের তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেগুলি যে কিরূপ অমূল্য, তা আমরা সকলেই উপলব্ধি করছি। একটা কথা তিনি বলেছেন যে, পরিণত বয়সে যে সমস্ত মানসিক রোগ হয়, তার ভিত্তি শৈশবেই স্থাপিত হয়ে যায়। মানসিক রোগ নিবারণ করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে শিশুদের

আমরা কিরূপ ভাবে কি রকম অবস্থার ভিতর মানুষ করছি, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তিনি আরও বলেছেন, মানুষের চরিত্রের মূল ভিত্তিগুলি অল্পবয়সেই স্থাপিত হয়ে যায়। শৈশবে শিশুরা বাবা-মার প্রভাবেই মানুষ হয়। সুতরাং বাবা-মার দায়িত্ব যে কত গুরুতর, তা আপনারা সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। শিশুমনকে সুষ্ঠুভাবে গ'ড়ে তোলা যে কি কঠিন কাজ, তা তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। তিনি শুধু দেখিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বাবা-মার কি রকম ব্যবহার করা উচিত, তার যথেষ্ট নির্দ্দেশও তাঁর রচনা থেকে পাওয়া যায়।

নানা দিক থেকে অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশে মনোবিদ্যা এখন একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন আমরা নূতন আবিষ্কারের সংখ্যা দিয়েই বিজ্ঞানের বিচার করি না। সেই সমস্ত আবিষ্কারগুলি সমাজের কোন কাজে লাগছে কি না, মানুষের দুঃখকষ্ট নিবারণ করবার কোন সহায়তা করছে কি না—এই দিক দিয়েই আজকাল আমরা বিজ্ঞানের বিচার করি। এখন দেখা যাক, মনোবিদ্যার এই আবিষ্কারগুলি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কি না, সমাজের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে কি না! ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সমাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা কথায় কথায় বলি, 'দেশের ভবিষ্যৎ', 'জাতির ভবিষ্যৎ' ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষাদানের যথোচিত ব্যবস্থা কি আমরা করতে সমর্থ হয়েছি? ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে বাবা মা মনে করেন, তাঁদের কর্ত্তব্য তাঁরা করলেন; এবং শিক্ষকেরাও গতানুগতিক পন্থায় শিক্ষাদান ক'রে তাঁদের কাজ শেষ করেন। ফলে উপযুক্ত শিক্ষা বলতে যা আমরা আজকাল

বুঝি, তা হয় না। এইখানে শিশুমন সম্বন্ধে মনোবিদ্যার নূতন আবিষ্কারগুলোর প্রয়োগ করবার একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র প'ড়ে রয়েছে।

আগেই বলেছি, শিশুমনের ভিতর যে তারতম্য আছে, সকলের বুদ্ধি যে এক রকমের নয় বা সমান তালে বৃদ্ধি পায় না, এ সম্বন্ধে মনোবিদ্‌রা অনেক গবেষণা করেছেন। তারতম্য যদি থাকে, তবে এক ধরনের শিক্ষাপ্রণালী সকলের পক্ষে সমান কার্য্যকরী কি ক'রে হবে? একটা দৃষ্টান্ত দিলে আপনারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন। ধরুন, পরীক্ষায় দেখা গেল যে, একজন ছেলে যখন কাজ করতে আরম্ভ করে, প্রথম থেকেই সে খুব ভাল করে, খুব মনোযোগ এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে, কিন্তু খানিকটা পরেই আর মনোযোগ দিতে পারে না; আর একটি ছেলের—তার অধ্যবসায় এবং মনোযোগের শক্তি কিছু কম না হ'লেও—কাজ আরম্ভ করতে এবং কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ লাগাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। এখন মনে করুন, আপনি স্কুলে ছেলেদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা যথেষ্ট দরকারী ব'লে মনে করেন এবং ক্লাসের এমন routine করেছেন যে, প্রথম ঘণ্টাতেই ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। ওই দুটি ছেলেই একই ক্লাসে পড়ে—ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে তাদের ফলাফল কিরূপ হবে ব'লে আপনি মনে করেন? প্রথম ছেলেটির যথেষ্ট উপকার হবে, কারণ সে প্রথম দিকেই খুব মনোযোগ দিতে পারে; এবং দ্বিতীয়টি ইংরেজী শিখতে পারবে না, কারণ তার মন তখনও সম্পূর্ণরূপে কাজে বসে নি, আমরাও মনে ক'রে নোব, ওর দ্বারা ভাষা শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমাদের এই বিচার কি ছেলেটির পক্ষে ন্যায়-বিচার হচ্ছে? ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থার যদি একটু ইতরবিশেষ করা যেত, তা হ'লে দ্বিতীয় ছেলেটিও প্রথমটির অপেক্ষা কিছু কম ইংরেজী শিখত না। আমি

শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিলুম। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যেতে পারে যে, শিক্ষাপ্রণালীর কত পরিবর্ত্তন দরকার। ক্লাসে একটি ছেলের বুদ্ধি হয়তো অন্যান্য ছেলে অপেক্ষা যথেষ্ট কম, সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা যদি সকলের পক্ষে একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করি, তা হ'লে সেই অল্পবুদ্ধি ছেলেটির মনের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়াই হয়। তার নিজের শক্তির হীনতা সম্বন্ধে তাকে অত্যন্ত সজাগ ক'রে তোলা হয়; সে কিছু পারে না, সে কিছু পারবে না—এই ভাব তার মনে জাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তার সমস্ত কাজেই উৎসাহ ক'মে যেতে পারে, কিংবা তার পক্ষে স্কুল পালিয়ে রাস্তায় অসৎ সংসর্গে ঘুরে বেড়ানোও কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু যদি আগে থেকে তার বুদ্ধির পরিমাপ নিয়ে তার প্রবৃত্তি কোন্ দিকে, তার ঝোঁক কিসে, এসব অনুসন্ধান ক'রে সেই অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ত, তা হ'লে সে হয়তো দুশ্চরিত্র হয়ে যেত না, বরং সমাজের একজন উপকারী সভ্যরূপে পরিগণিত হতে পারত। পাশ্চাত্য দেশে, আমেরিকায় ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার সময় নানারূপ পরীক্ষা ক'রে তাদের মনের সব রকম বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। আমি আশা করি, আমাদের দেশেও অদূর-ভবিষ্যতে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে এই রকম ব্যবস্থা প্রচলিত হবে।

তারপর ধরুন, যাদের জন্মাবধিই কোন একটি অঙ্গের হানি আছে—যেমন অন্ধ, বধির, বোবা ইত্যাদি—এদেরও মনোবিদ্যার তথ্যানুযায়ী শিক্ষা দিয়ে যে সমাজের হিতকর কাজে নিযুক্ত করা যায়, তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। Blind School, Deaf and Dumb School-এর ছাত্রছাত্রীরা কি রকম উন্নতি করছে, তার বিষয় আপনারা অবগত আছেন। এসব ছাড়াও মনোবিদ্যা প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দেবার নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করেছে। ছেলেদের মনোযোগ কেমন

ক'রে আকর্ষণ করতে হয়, তাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি কি রকম ক'রে হিতকর কার্য্যে লাগানো যেতে পারে, কি রকম ক'রে তাদের অভ্যাস গঠন করা যায়, কুঅভ্যাস দূর করা যায়, এসব সম্বন্ধেই মনোবিদ্যা আমাদের যথেষ্ট কার্য্যকরী উপায় দেখিয়ে দিয়েছে, এবং এই সব উপায় অবলম্বন ক'রে কাজ করবার বিশাল ক্ষেত্র আমাদের দেশে প'ড়ে রয়েছে।

তারপর ধরুন, মানসিক ব্যাধি। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও মানসিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে, এখন বোধ হয় প্রত্যেক চার-পাঁচটি পরিবারের মধ্যে একজন না একজন মানসিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। জীবন-ধারণের জন্য সংগ্রাম ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে, কিন্তু সেই সংগ্রামের সম্মুখীন হবার উপযুক্ত মানসিক সরঞ্জাম আমাদের থাকছে না, ফলে সংগ্রাম এড়িয়ে যাবার জন্য মানসিক রোগের আশ্রয় নিতে অনেকেই বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ফ্রয়েড প্রমুখ মনঃসমীক্ষকেরা আমাদের বিশদভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, এ রকম অবস্থার হাত থেকে কি ক'রে উদ্ধার পাওয়া যায়। শিশুমনকে উপযুক্তভাবে গ'ড়ে তোলা—এই সমস্যা সমাধানের একটি প্রধান উপায়। শিশুমনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ক'রে শিশুদের বুদ্ধি, বিক্ষোভ (emotion) সমূহ কি ভাবে ক্রমশ পরিণত হয়, এই সমস্ত দেখিয়ে দিয়ে, এই গ'ড়ে তোলার কাজ কি ক'রে সুসম্পন্ন করা যায়, ফ্রয়েড তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। পিতা, মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রভৃতির এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। Mental Hygiene Movement এই জ্ঞান প্রচারের কাজ হাতে নিয়ে সমাজের কল্যাণ-সাধনেই রত হয়েছেন। অনেকের ধারণা আছে, মানসিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা—যেমন হিষ্টিরিয়া-রোগীরা—মোটেই কষ্ট পায়

না, কষ্টের ভান করে মাত্র, সুতরাং একটু গুরুতর রকমের চিকিৎসা করলেই (আগে প্রহারাদিও চলত) সেরে যাবে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। মানসিক রোগীরা যে সত্যি সত্যিই কষ্ট পায়, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। আর যে বাড়িতে একটি মানসিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তি থাকে, সে বাড়ির লোকেরাও কিরূপ ভয়ানক অসুবিধা কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কিন্তু এই সমস্ত কষ্ট নিবারণ করবার পন্থা বিদ্যমান রয়েছে। একমাত্র মনোবিদ্যাই সেই পন্থার নির্দ্দেশ করতে সমর্থ। এখানেও আমরা মনোবিদ্যার প্রয়োগের আর একটি ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি।

গার্হস্থ্য জীবনও মনোবিদ্যা প্রয়োগের একটি ক্ষেত্র। এ কথা হয়তো সহজে আমাদের কল্পনায় আসে না। কিন্তু প্রত্যেক পরিবারেই, বিশেষত যুক্ত পরিবারে, একটা না একটা বাইরের ঘটনা নিয়ে ক্রমাগতই অনেক অশান্তি, অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। আসলে এই সব অশান্তি সৃষ্টির মূলে থাকে পরস্পরের মানসিক বৃত্তির সংঘর্ষ। অজ্ঞাত হিংসা দ্বেষ, অবদমিত ভালবাসা কামনা প্রভৃতি যে কত সংসারে কত অনর্থের সৃষ্টি করে, আমরা সহজে ধারণা করতে পারি না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনবরত কলহ হতে থাকলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। তাদের মানসিক পরিণতির পক্ষে এই ধরনের কলহ যথেষ্ট ক্ষতিকর, এই কলহের কত রকম কারণ হতে পারে, মনোবিদ্‌রা তার অনুসন্ধান করেছেন। কোন ঘটনার কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারলে ঘটনাটিকে নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হয়, কারণ জ্ঞানই শক্তি। কিন্তু তাই ব'লে আপনারা এ কথা মনে করবেন না যে, অচিরেই একটি দিন আসবে, যেদিন এই দাম্পত্য-কলহ সংসার থেকে চিরকালের জন্য চ'লে যাবে। কারণ এই কলহের মধ্যে আবার একটা

মাধুর্য্যেরও দিক আছে এবং সেটুকু উপভোগ করবার লোভ মানুষের থেকেই যাবে। আপনারা আশ্বস্ত হোন, মনোবিদ্‌দের মধ্যেও দাম্পত্য-কলহ হয়ে থাকে। ওই যে আমাদের এখানকার শ্রেষ্ঠ মনোবিদ্ উপস্থিত রয়েছেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন না ওঁদের কি দাম্পত্য-কলহ হয় না? তবে এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে এবং এর ফলাফলের বিষয়ে সচেতন থাকলে জিনিসটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়।

আরও একটি ক্ষেত্রের কথা বলি, যেখানে মনোবিদ্যা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আজকাল বেকার-সমস্যা সমাজের একটি কঠিন সমস্যা। অনেকেই উপদেশ দিয়ে যুবকদের বলেন, বাপু হে, চাকরি-টাকরি আর হবে না, ব্যবসা করগে, বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর সন্ধান পাবে। কিন্তু ব্যবসায় কৃতকার্য্যতা লাভ করতে হ'লে যে সব মনোবৃত্তির, সামর্থ্যের, গুণের প্রয়োজন হয়, সে সমস্ত কি সকলের মধ্যে আছে? না থাকা সত্ত্বেও অনেকে ব্যবসায় ঝাঁপিয়া প'ড়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন। ক্ষতি শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, মানসিক ক্ষতিও যথেষ্ট। অশান্তি, সমাজের প্রতি একটা আক্রোশ, একটা হতাশার ভাব, এই সমস্ত সঞ্চয় ক'রে এবং অর্থের অপচয় ক'রে অনেকে ব্যবসা থেকে ফিরে এসেছেন, কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছেন। সুতরাং এ রকম একটা কাজে নামবার আগে নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া বিশেষ দরকার। এইখানে মনোবিদ্যা আমাদের সাহায্য করতে পারে। নানা রকম পরীক্ষার দ্বারা মনোবিদ্‌রা আজকাল অনেকটা নিশ্চয়তার সঙ্গে ব'লে দিতে পারেন, কোন একজন লোক ব্যবসাক্ষেত্রে নামবার উপযুক্ত কি না। শুধু তাই নয়, যারা স্কুল থেকে পাস ক'রে সবে বেরিয়েছে, তারা কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করলে সাফল্য লাভ করতে পারবে, উপযুক্ত মানসিক

পরীক্ষার দ্বারা তার ইঙ্গিতও পাওয়া যেতে পারে। কোন্ কোন্ পেশাগুলিতে কি কি মানসিক বৃত্তি অন্তত কতখানি পরিমাণ থাকা প্রয়োজন, পেশাগুলি বিশ্লেষণ ক'রে সেটা যেমন মনোবিদ্‌রা অনেকখানি ঠিক করেছেন, তেমনই আবার সেই বৃত্তিগুলি কোন একজন লোকের কতখানি পরিমাণ আছে, তা নির্ণয় করিবার পন্থাও মনোবিদ্যা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। আমি অবশ্য বলতে চাই না যে, এ বিষয়ে সব অনুসন্ধান শেষ হয়ে গেছে—আমরা পূর্ণ সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছি। তবে এদিকে কাজ যে অনেকটা এগিয়েছে, এ কথা এখন জোর ক'রেই বলা চলে। আপনাদের জানাতে আমার যথেষ্টই আনন্দ হচ্ছে যে, আজ প্রায় তিন বছর হ'ল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা-বিভাগে এই পেশাসংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজ বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং তাদের পেশাসংক্রান্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। রীতিমতভাবে এই কাজ চালাতে পারলে অনেক মানসিক শক্তির বৃথা অপব্যয় থেকে যে সমাজকে খানিকটা বাঁচানো যাবে—যেমন অন্যান্য দেশে হচ্ছে—সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই।

যারা চুরি ক'রে, খুন ক'রে এবং অন্য নানা রকম অত্যাচার ক'রে বেড়ায়, তারা সকলেই কি দণ্ডার্হ? এও আজকাল একটা ভাববার কথা হয়েছে। অনেকেই হয়তো তাদের মধ্যে দণ্ডার্হ নয়, বরং তাদের চিকিৎসারই দরকার। Criminal-দের সম্বন্ধে ধারণার এবং তাদের সংক্রান্ত প্রচলিত আইনগুলির যে পরিবর্তন প্রয়োজন, সে কথা আজকাল অনেক চিকিৎসক এবং আইনজ্ঞেরাও স্বীকার করছেন। তাঁদের মধ্যে যে এই মনোভাবের সঞ্চার হয়েছে, তার জন্য মনোবিদ্যার উন্নতিই দায়ী। সমাজে যদি দুর্বৃত্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তবে সেটা শুধু দুর্বৃত্তদেরই

দোষ নয়, দোষ সমাজেরও। পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অনেক অপরাধ আপনিই নিবারণ হয়ে যায়।

মনোবিদ্যার প্রয়োগ কত রকম কত বিভিন্ন স্থানে হতে পারে, তার কিছু আভাস মাত্র আজকে আমি আপনাদের কাছে দিয়েছি। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই এখনও যথেষ্ট প্রয়োগ হয় নি অনেক কারণে, যথা অর্থের অভাব, সাধারণের এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব, সমবেত চেষ্টার অভাব প্রভৃতি। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, সকলেই মনোবিদ্যার উপকারিতা অন্তরে অন্তরে স্বীকার করবেন, এবং সেই দিন থেকেই কর্ম্মজীবনে মনোবিদ্যার প্রয়োগের যথেষ্ট ব্যবস্থা হতে আরম্ভ হবে।

ভাদ্র, ১৩৪৭

মনোবিদ্যার পঁচিশ বৎসর

মনোবিদ্যার প্রসার ও উন্নতি পশ্চিম দেশেই বেশি। আধুনিক যে সমস্ত বিদ্যা ও বিজ্ঞান সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে, তার সবগুলিই প্রতীচ্য সভ্যতার দান। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার মত আধুনিক মনোবিদ্যাও ইউরোপে ও আমেরিকায় বর্দ্ধিত হয়ে ভারতবর্ষে এল কয়েকজন সে-দেশে-শিক্ষিত ভারতবাসীর চেষ্টার ফলে। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানী ব্যক্তি ও ঋষিরা মন সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে আলোচনা হ'ত দর্শনের রূপে, বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে নয়। ভারতবর্ষে নূতন মনোবিদ্যাকে প্রথম প্রচার করে বাঙালী, এবং বাঙালীর চেষ্টা ও চর্চ্চার ফলেই যে এ বিদ্যার একটি বিশিষ্ট রূপ এখানে গ'ড়ে উঠছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এ দেশে মনোবিদ্যার উন্নতির ধারা লক্ষ্য করলে তিনটি দিক দেখা যায়। এক, মনোবিদ্যার শিক্ষা ও গবেষণা। দুই, সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার। তিন, মনোবিদ্যার প্রয়োগে জীবনযাত্রার সৌকর্য্য-সাধন। আমাদের এই ভারতবর্ষে মনোবিদ্যার চর্চ্চা গত পঁচিশ বৎসরে কি হয়েছে, তারই আলোচনা করছি।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সার্ আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার ছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন, বাঙালীর জীবনকে স্ফূর্ত্ত ও বিকশিত করতে গেলে বাঙালীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা থাকা চাই। তাই তিনি বিজ্ঞান-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় নূতন মনোবিদ্যাও পাঠ্য-বিষয়ের অন্তর্গত হ'ল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার পাঠ্যতালিকায় স্থান পেল। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম. এ. মহাশয়ের* উপর এই বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত

* ইনি পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। গত ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

হ'ল। এই বিজ্ঞানের তখন নাম ছিল Experimental Psychology, অর্থাৎ প্রায়োগিক মনোবিত্থা। তথ্যগুলিকে প্রয়োগশালায় পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা আছে ব'লে ওই নামেই মনোবিদ্যাকে প্রথম এখানে Post Graguate Class-এর পাঠ্যবিষয় করা হয়। মনোবিদ্যা প্রথমে দর্শন-শাখার অধীন ছিল। দর্শনের ছাত্রদের মনোবিদ্যা পড়তে হ'ত, এখনও হয়। সেই মনোবিদ্যা থেকে পৃথক করবার উদ্দেশ্যে প্রায়োগিক কথাটি মনোবিদ্যার গোড়ায় যোগ ক'রে নূতন বিষয়টি যে বিজ্ঞানেরই অঙ্গীভূত এটা বোঝাবার চেষ্টা ছিল। মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) মনো-বিদ্যার অন্তর্গত পাঠ্যবিষয় ছিল। মনঃসমীক্ষণের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছিলেন এবং তার শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। বিষয়টি তখন ইউরোপেই শিশু অবস্থায়। জার্মান ভাষায় কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং ভিয়েনাতে ওই নিয়ে পরীক্ষা ও আলোচনা চলছে। ইংরেজীতে ভাল বইয়ের তখনও যথেষ্ট অভাব। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও মনঃসমীক্ষণকে মনোবিদ্যার অধীন ক'রে এম. এ., এম. এস-সি.তে শিক্ষিতব্য বিষয়ের পংক্তিতে বসানো হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের প্রধান শিক্ষক ভারতের শ্রেষ্ঠ মনঃ-সমীক্ষক। অন্য শিক্ষকদের মধ্যেও মনঃসমীক্ষক রয়েছেন। মনোবিদ্যা-বিভাগে মাত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট মনে করেন নি। শিক্ষক ও ছাত্রদের মনোবিদ্যার মৌলিক গবেষণার সুযোগও ক'রে দিয়েছিলেন। মনোবিদ্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ মৌলিক গবেষণায় রত রইলেন। মনোবিদ্যার প্রসারের দিকে ছাত্র ও শিক্ষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে তাঁরা একটি সমিতির অভাব বোধ করলেন। সেই অভাব দূর করবার এবং মনোবিদ্যার আলোচনা ও গবেষণার ফলকে সম্যক বিচার করবার উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে

উঠল। একটির নাম—ভারতীয়-মনোবিদ্যা-সমিতি (Indian Psychological Association), এবং অপরটির নাম—ভারতীয়-মমঃসমীক্ষণ-পরিষৎ (Indian Psycho-analytical Society)। প্রথমটির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এর আগেই ভারতীয় মনোবিদের গবেষণা ইউরোপীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অবদমন সম্বন্ধে ডঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু নিজের অভিমত ও গবেষণা ইংরেজী ভাষায় লিখিত 'কন্‌সেপ্ট অফ রিপ্রেসন' (*Concept of Repression*) বইয়ে প্রকাশ করেন। এই বইখানি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

সেই সময় মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে ইউরোপে যথেষ্ট আলোচনা চলেছে। সেখানকার আলোচনা তখন প্রকাশিত হ'ত প্রধানত জার্মান ভাষার বাহনে। জার্মান ভাষায় অজ্ঞতা হেতু এবং ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট পুস্তকের অভাবে বাঙালী মনোবিদের পক্ষে মনঃসমীক্ষণের প্রসারের সঙ্গে যোগ রাখার বিশেষ অসুবিধা ঘটে। সৌভাগ্যের বিষয়, সে অসুবিধাকে অতিক্রম ক'রে এ দেশে মনঃসমীক্ষণ গ'ড়ে উঠতে থাকে। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে চিকিৎসায় অধিকার লাভ করতে গেলে আধুনিক পদ্ধতিতে নিজেকে অপর সমীক্ষকের নিকট সমীক্ষিত হতে হয়। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা নিজের গূঢ়ৈষণা (Complex) দূরীভূত হয় এবং অপরের ক্ষেত্রে তার বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান জন্মে। ইউরোপে মনঃ-সমীক্ষণের স্থষ্টিকর্ত্তা ডঃ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড যেমন প্রথম ব'লে অপরের দ্বারা সমীক্ষিত না হয়ে সমীক্ষক হয়েছেন, এ দেশের মনঃসমীক্ষণের প্রবর্ত্তক ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর অবস্থাও তাই। তিনি রোগীর রোগ আরোগ্য করতে করতে মনঃসমীক্ষণকে আয়ত্ত করেন। তাঁর সভাপতিত্বে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়-মনঃসমীক্ষণ-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আন্তর্জ্জাতিক-মনঃসমীক্ষণ-সমবায়ের সঙ্গে (International Psycho-analytical

Society) যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়। এর আগে পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক-সমবায়ের মাত্র আটটি শাখা-পরিষৎ গ'ড়ে উঠেছিল। এশিয়ার মধ্যে ভারতীয় পরিষৎই প্রথম। ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষক ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করলে দেশ বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী তাঁর কাছে ছাত্র হয়ে আসেন। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ ক'রে তাঁরা যখন দেশে ফিরলেন, তখন নিজ নিজ দেশে মনঃসমীক্ষণের আলোচনার জন্য শাখা-সমিতি গ'ড়ে আন্তর্জ্জাতিক-সমবায়ের অধীনতা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। ভারতের মনঃসমীক্ষণ-পরিষৎ কিন্তু অন্যভাবে গ'ড়ে উঠেছিল। এখানকার প্রতিষ্ঠাতা ফ্রয়েডের সাক্ষাৎ-শিষ্য নন এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে থেকেও নিজের চেষ্টায় মনঃসমীক্ষণকে আয়ত্ত করেন। বসু মহাশয় নিজের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান বন্ধু ও ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন এবং এঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর নিকট সমীক্ষিত হন। আন্তর্জ্জাতিক-সমবায়ের মুখপত্র-স্বরূপ যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি মনঃসমীক্ষণের জ্ঞানবিস্তারের জন্য প্রকাশিত হয়, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ বসু তার সম্পাদক-মণ্ডলীর সভ্য মনোনীত হন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জ্জাতিক-মনঃসমীক্ষণ-সমবায়ের যে সম্মেলন জার্মানির অন্তর্গত Wiesbaden-এ হয়, ভারতের প্রতিনিধি-রূপে তাহাতে যোগদান করার সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়-মনোবিদ্যা-সমিতির মুখপত্ররূপে 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকলজি' (*Indian Journal of Psychology*) প্রথম প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার মুদ্রণকার্য্যের সমস্ত ভার বহন ক'রে আসছেন। ভারতবর্ষের মনোবিদ্‌দের গবেষণা ও পরীক্ষার ফল এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এ পত্রিকা প্রচারিত হয়। মনোবিদ্যা আলোচনার যত কেন্দ্র আছে, তার অধিকাংশ স্থলেই এই পত্রিকার সমাদর আছে। ইউরোপ

আমেরিকার অনেক প্রধান মনোবিদ্যার পত্রিকায় এই পত্রিকাতে লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে অভিমত ও আলোচনা প্রকাশ হয়। অধিকন্তু এই পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ ও গবেষণার সার অনেক বিদেশীয় পত্রিকায় সঙ্কলিত হতে দেখা গেছে। অবশ্য এ কথাও বলা আবশ্যক যে, এই পত্রিকা প্রকাশের আগেও এ দেশের মনোবিদ্যার আলোচনা ও গবেষণার ফল বিদেশীয় মনোবিদ্যার পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে, এবং পত্রিকা প্রকাশিত হবার পরও কেউ কেউ পাশ্চাত্য দেশের পত্রিকায় চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ ক'রে ওদেশে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান আলোচনার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে, এর উদ্দেশ্য বছরে একবার ক'রে প্রায় সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনের অনুষ্ঠান করা। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বৈজ্ঞানিকরা এসে নিজেদের সারা বছরের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলের আলোচনা ক'রে থাকেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করা আছে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে যে অধিবেশন হয়েছিল, সেই অধিবেশনে বাংলার মনোবিদ্‌দের চেষ্টায় মনোবিদ্যার জন্য একটি বিশেষ বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। এই শাখার সভাপতির তালিকায় বাঙালীরই নাম বেশি।

ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার মতই প্রতি বৎসর ভারতীয় দার্শনিক সভার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ভারতের প্রায় দার্শনিকই এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দান ক'রে থাকেন। দর্শনকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ক'রে প্রত্যেক বিষয়টির অন্য একটি শাখা-সমিতি আছে। মনোবিদ্যা তেমনই একটি শাখা। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। মনোবিদ্যা-শাখার সভাপতি প্রায়ই বাঙালীরা

হয়ে থাকেন। বাঙালীদের প্রবন্ধই বেশি থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানাগারের শিক্ষক ও ছাত্রেরা নিজেদের জ্ঞানের প্রসারতার জন্য এই দুইটি অনুষ্ঠানকে অবলম্বন ক'রে থাকেন।

বাঙালী মনোবিদ্‌দের গবেষণার খ্যাতি এখনও পৃথিবীতে যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়ে নি। তবু ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর (A new Theory of Mental Life) মনোজীবনের নব ব্যাখ্যা, লেখকের Suggestions for a New Theory of Emotion, অধ্যাপক রঙীন হালদারের শিল্পকলার ব্যাখ্যা প্রভৃতি নূতন চিন্তাধারার আভাস দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের মনোবিদ্যার ধারা সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও দেখা যায়। সেই সম্পর্কে ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, যদুনাথ সিংহের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতে মনোবিদ্যার প্রয়োগশালা প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়। পরে ঢাকা, মহীশূর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে মনোবিদ্যার জন্য প্রয়োগশালার প্রতিষ্ঠা হতে দেখা গেছে। সম্প্রতি কাশী, মজঃফরপুর প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে সে ব্যবস্থার সূচনা জানা যাচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানাগার থেকে শিক্ষা পেয়ে অনেকে ওই সমস্ত শিক্ষালয়ে অধ্যাপনা করছেন। বিজ্ঞান-হিসাবে মনোবিদ্যার চর্চ্চা ছাড়াও দর্শনের অধীনে মনোবিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা অনেক দিন ধ'রেই এদেশে আছে। দর্শনের অধীনে মনোবিদ্যার শিক্ষা-ব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তথ্য ও ব্যাখ্যা না শিখিয়ে পুরনো পুরনো তাত্ত্বিক জ্ঞান শেখানো হয়ে থাকে। খুব সম্প্রতি এ শিক্ষাবিধির পরিবর্ত্তনের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। তাত্ত্বিক বা শাস্ত্রিক জ্ঞানের চেয়ে প্রায়োগিক জ্ঞানালোচনায় বিজ্ঞানের প্রসারতা ও উন্নতি ঘটে।

মনোবিদ্যাকে দর্শনের অধীনে না রেখে তাকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান স্বীকার ক'রে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

মনোবিদ্যার জ্ঞান ও তথ্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা বাঙালী মনোবিদ্‌দের আছে। বাংলা মাসিকপত্রে এবং বাংলা দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে মনোবিদ্যার অনেক সাধারণ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সহজ ভাষায় সাধারণের জ্ঞানের ও বোধের উপযোগী ক'রে এগুলি লেখা। ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রথম মনোবিদ্যার বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। শ্রীরঙীন হালদার 'মনের রোগ' নাম দিয়ে লিখেছিলেন। তারপর থেকে অনেকে বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত না হয়েও সাধারণের মধ্যে মনোবিদ্যার নাম ও জ্ঞান ছড়িয়েছে। ডঃ বসুর 'স্বপ্ন' বইখানি যে খ্যাতি ও আদর পেয়েছে, তা থেকে মনে করা অন্যায় হবে না যে, বাঙালীর মনোবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ এসেছে। বৈজ্ঞানিক সভা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত নয় এরূপ প্রবন্ধ এবং বইও ছাপা হয়েছে। সেগুলি বৈজ্ঞানিক মর্য্যাদা পায় নি। দুই-এক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতও হয় নি, কখনও বা ইংরেজী প্রবন্ধের ভাষান্তর মনে হয়েছে। মনোবিদ্যার ভুল ধারণা অনেক সময় এসবের মধ্যে থেকে গেছে। তবু এই সব চেষ্টা থেকে মনে হয় যে, মনোবিদ্যার প্রতি সাধারণের বেশ আসক্তি আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনেবিজ্ঞানাগার ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণের উপযোগী ক'রে মনোবিদ্যার পুস্তিকা লিখে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অবাঙালীর কাছে এ জ্ঞানপ্রচারের সম্ভাবনার কথা ভেবে তাঁরা একখানি ইংরেজী পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'জীবনযাত্রায় মনোবিদ্যার প্রয়োগ' নামে একখানি বাংলা

পুস্তক প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত বইয়ের প্রথম সংস্করণ বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়েছে এবং নামমাত্র চার আনা মূল্যে বিক্রয়ের জন্য উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রাকে মনোবিদ্যার প্রয়োগে সুকর ও সহজ করবার উদ্দেশ্যে এই বই প্রণীত।

মনোবিদ্যার জ্ঞান ও ব্যাখ্যাকে সাধারণের মধ্যে সুলভ ও সহজসাধ্য করবার জন্য এখানকার মনোবিজ্ঞানীরা এক উপায় স্থির করেছেন। প্রতি বৎসর কয়েকটি সমিতির মিলিত চেষ্টায় কলিকাতায় একটি স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর উদ্যোগ হয়ে থাকে, বহু নরনারী জ্ঞানলাভের জন্য এই প্রদর্শনীতে আসেন। কলিকাতা মনোবিজ্ঞানাগার এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচার করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বক্তৃতার দ্বারা, জ্ঞাপনী, রেখাচিত্র, বিবিধ চিত্র প্রভৃতি সাহায্যে এবং যন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়ে মনোবিদ্যার ব্যবহারিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রথম এ ধরনের প্রয়াস দেখা যায়। তারপর থেকে এঁরা ক্রমশ কলকাতার শহরতলী ছাড়িয়ে মফস্বলে প্রচারের জন্য যাচ্ছেন। এখন বহু স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীতে মনোবিজ্ঞানাগারের যোগ দেখা যাচ্ছে। লোকশিক্ষার এ পদ্ধতি এঁদের হাতে বেশ কর্ম্মপ্রসূ হয়েছে। রেডিওতে শ্রীযুত হরিপদ মাইতি প্রভৃতি মনোবিদ্‌রা প্রায়শই বক্তৃতা দিয়ে থাকেন।

বাংলাতে মনোবিদ্যার প্রসার ও আলোচনা সম্পর্কে মনোবিদ্যার প্রয়োগের কথার উল্লেখ করা উচিত। কোন্ বিজ্ঞান কত মানুষের উপকারে কতখানি লাগে, এই বিচার ক'রে তার প্রাধান্যের নির্দ্দেশ হয়ে থাকে। এখন আর মানুষ শাস্ত্রকে শুধু চিন্তার রাজ্যে রাখতে চায় না। চিন্তা ও পরীক্ষার দ্বারা আহৃত জ্ঞান ও বিদ্যাকে জীবনযাত্রায় প্রয়োগ

ক'রে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচার করে। শাস্ত্রিক ও বৈদিক চর্চ্চায় আধুনিক মানুষ তৃপ্ত নয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রাকেও সহজ ও আরামদায়ক করে ব'লে তার মূল্য অনেক বেশি। বিজ্ঞানমাত্রেরই এই প্রয়োগিকতা অবশ্যম্ভাবী। মনোবিদ্যার সে সম্ভাবনা আছে কি না, সে বিচার অবশ্যকর্ত্তব্য।

আধুনিক মনোবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে মানসিক বিকার ও রোগের প্রতিকার ব্যাপারে। মনের রোগ দূর করতে মনঃসমীক্ষণের ব্যবহার এদেশে ডঃ বসু প্রথম করেন। নিজে চিকিৎসা ক'রে তিনি অনেক রোগ আরোগ্য করেছেন। তারপরে বাঙালীর মধ্যে কয়েক জন এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে মনের রোগের চিকিৎসা করেছেন। অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীহরিপদ মাইতির নাম করা যেতে পারে। দুজনেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-বিভাগের শিক্ষক। এই চিকিৎসা অত্যন্ত সময় ও অর্থ সাপেক্ষ। সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। অথচ এর দরকার বহুল। তাই জনসাধারণ যাতে মনের রোগের চিকিৎসা করাবার সুযোগ পায়, সেজন্য শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় মানসিক স্বাস্থ্য সমিতির তরফ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে কারমাইকেল মেডিক্যোল কলেজে একটি ক্লিনিক খোলেন। প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত অবৈতনিকভাবে মানসিক রোগীদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ডঃ বসু তাঁর ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান ছাত্রদের সাহায্যে এই অনুষ্ঠানটির কাজ করেন।

নিরাময়তার চেয়ে প্রতিষেধ অনেক ভাল। মানসিক বিকারের সম্ভাবনা নষ্ট করবার জন্য মনোবিদ্যার জ্ঞান সাহায্য করতে পারে। মনের সুখের বিঘ্ন যাতে উপস্থিত না হতে পারে এবং সুখের উপায়

যাতে নিজ অধিগত হয়, সেই উদ্দেশ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আন্দোলন সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপীয়রা এই আন্দোলন এদেশে আমদানি করেন, কিন্তু বাঙালীর উদ্যোগে এর প্রসার হচ্ছে।

ভারতীয়-মানসিক-স্বাস্থ্য-সমিতির কলকাতার শাখার প্রতি মাসেই একটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভ্য ব্যতীত জনসাধারণের উপস্থিতি কামনা করা হয়। প্রতি অধিবেশনে জনৈক মনোবিদ্ বক্তৃতার দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যের উপায়, বিধি প্রভৃতির কোন একটি বিষয় বুঝিয়ে দেন। এত সহজ ও সরল ভাষায় বক্তৃতা করা হয় যে, মনোবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা শক্ত হয় না। শ্রীহরিপদ মাইতি এই শাখা-সমিতির সম্পাদক। ডঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রায়ই বক্তৃতা ক'রে থাকেন।

লেখাপড়া বিষয়ে মনোবিদ্যার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি এখানকার শিক্ষকদের সে কথা মনে হয়েছে। তাঁরা মনোবিদ্যা শিখতে ও জানতে চাইছেন। দুই-এক জন মনোবিজ্ঞানীকে শিক্ষা-কেন্দ্রের সম্পাদক বা কর্তা হিসাবে দেখা গেছে। ছেলেমেয়েদের মনের কথা না জানলে, তাদের মনের গতির জ্ঞান না থাকলে তাদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় এর অভাবে বিদ্যাদান অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক বুদ্ধিমান ছেলেকে না বুঝে দুষ্ট ও বদমায়েস ক'রে তোলা হয়। শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের মনোবিদ্যা-অনুমোদিত পদ্ধতি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীগোপেশ্বর পাল মহাশয় অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে মনোবিদ্যার জ্ঞানলাভের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, এমন কি অনেকে ছাত্র-ছাত্রী-হয়ে মনোবিজ্ঞানাগারে শিক্ষার জন্য আসছেন। শিক্ষার ব্যাপারে মনোবিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণা

দেখা যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষেরা শিক্ষাতত্ত্বের ছাত্রীদের মনোবিজ্ঞানাগারের প্রয়োগশালায় এনে মনোবিত্থার যন্ত্রপাতি, পরীক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি দেখিয়ে শুনিয়ে মনোবিদ্যার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক বোঝবার চেষ্টা করছেন। মনোবিদ্যায় জ্ঞানলাভ ক'রে অনেক ছাত্র পরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে শিক্ষকতায় মনোবিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের মনেবিদ্যায় উৎসুক করবার চেষ্টা করছেন।

মনোবিজ্ঞানাগার দুষ্ট অবোধ শিশুদেরও পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছেন। দুর্ব্বলমনা, উনমানসিক শিশুদেরও পরীক্ষা ক'রে মনোবিজ্ঞানাগারের কর্তৃপক্ষেরা জনসাধারণকে নিজেদের জ্ঞানের ব্যবহারিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, ঝগড়া প্রভৃতি অশান্তিকর ব্যাপারকে অতিক্রম কিংবা সহজ করা সম্ভব। গিরীন্দ্রবাবু নিজের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও পরীক্ষার দ্বারা সে বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ ও উপায় উদ্ভাবন করেছেন, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় বক্তৃতাকালে সর্ব্বসাধারণকে সেসব জানিয়েছেন।

কারখানায়, শিল্পাগারে, ব্যবসায়-কেন্দ্রে মনোবিদ্যার প্রয়োজন আছে। মনোবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে অন্যান্য দেশে অনেক উপকার সাধিত হয়েছে। কোন্ পরিশ্রমে কিরূপ বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে কাজের সুবিধা হয়; কর্ম্মস্থলে কি প্রকারের আবেষ্টনের সৃষ্টি করা উচিত, যাতে পরিশ্রমের লাঘব হয়, কর্ম্মেচ্ছা বৃদ্ধি পায়—মনোবিজ্ঞানী নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও পরীক্ষার দ্বারা সে জ্ঞান বিতরণ করতে পারেন। কারখানায় মনোবিদ্যার প্রয়োগ করবার প্রথম চেষ্টা করেন অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩২-১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টাটার লোহার কারখানা, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি কারখানায় গিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক

আরম্ভ করেন। মজুরদের পরিশ্রম-ক্ষমতা ও ক্লান্তি মাপবার উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের সহায়তায় পরীক্ষা করেছেন।

মনোবিদ্যার প্রযোজ্যতা এত বেশি যে, সর্ব্বত্র মনোবিদ্যার বিভাগ খুলে গবেষণা ও শিক্ষাদান করা উচিত। মনোবিদ্যার অধীতব্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি ও ধনী ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই দিকে না ফিরলে মনোবিদ্যার উন্নতিপথে বাধা থেকে যাবে।

বাংলায় মনোবিদ্যার প্রসার যে শাস্ত্রিক আলোচনায় গণ্ডিবদ্ধ থাকে নি, এটা বাঙালীর গৌরবের বিষয়। সুযোগ পেলে বাঙালী মনোবিদ্ দেশ, সমাজ প্রভৃতিকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। গবেষণা ও চিন্তার দ্বারা নূতন নূতন পথ আবিষ্কার ক'রে জাতিকে উন্নতির পথে যথেষ্ট এগিয়ে দেবার সামর্থ্য তাঁর আছে ব'লেই আমি মনে করি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২